পিনাকী ভট্টাচার্য

সোনার বাঙলার রূপালী কথা

বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল
ইতিহাসের সহজপাঠ

সোনার বাঙলার
রূপালী কথা

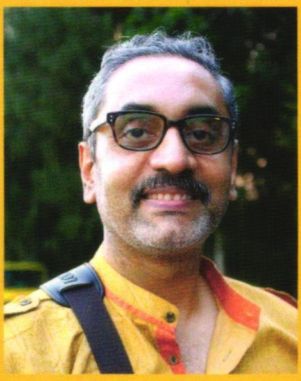

পিনাকী ভট্টাচার্য। লেখক ও একটিভিস্ট। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্লগার। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু পেশা হিসেবে নেন নাই। দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয় কিন্তু তিনি আরো বিচিত্র বিষয়ে লেখালেখি করেন। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ সাত।

বাতিঘর বিক্রয়কেন্দ্র

বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
বাতিঘর রাজশাহী : ৮৬ খানসামার চক, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট
বাতিঘর শাহবাগ : ৪৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
বাতিঘর বাংলাবাজার : রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বাতিঘরের বই ও দেশি-বিদেশি যেকোনো বই
অর্ডার করুন অনলাইনে অথবা ফোনে
www.baatighar.com
+৮৮ ০১৯৭৩ ৩০৪ ৩৪৪

https://nagorikpathagar.org

সোনার বাঙলার

রূপালী কথা

বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সহজপাঠ
(আদিকাল থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত)

পিনাকী ভট্টাচার্য

ঢাকা : বাংলা মোটর । শাহবাগ । বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম । রাজশাহী । সিলেট

https://nagorikpathagar.org

সোনার বাঙলার রূপালী কথা
প্রকাশক : বাতিঘর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬, পিনাকী ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সাইলেনটেক্সট
ষষ্ঠ মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৪২৯, ডিসেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
মুদ্রণ : এস আর এল প্রিন্টিং প্রেস, ২৫/এফ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Sonar Banglar Rupali Kotha
A History of Bengal from Ancient Period to British Regime
by Pinaki Bhattacharya
Published by Baatighar
Bishwo Shahitto Kendro Bhaban
17 Mymensingh Road, Bangla Motor, Dhaka, Bangladesh
Email : baatighar.pub@gmail.com
Sixth Print : December 2022
Fisrt Published : February 2016
Price : Taka 400.00 USD 20.00
ISBN : 978-984-8825-16-7

https://nagorikpathagar.org

চিত্তরঞ্জন দাশ
যিনি বাঙালীকে মায়ের মমতায় ভালোবেসেছিলেন

https://nagorikpathagar.org

সূচী

কাপড়ের ভাঁজে ইতিহাস	১১
বগুড়ার পথে	১৫
বগুড়া থেকে ইতিহাস পাঠ	২৭
চর্যাপদ বাঙলার প্রাচীন কাব্য	৪১
ভীমের জাঙ্গাল	৪৭
আদি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান পাঠ	৫৫
পাল রাজার শেষ, সেন রাজের শুরু	৬৫
বাঙলায় মুসলিম শাসনের শুরু	৭৩
বাঙলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার	৮১
সুলতান গিয়াসউদ্দিনের স্বর্ণযুগ	৮৭
বাঙলার মাটিতে বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বীজ	৯১
বাঙলা প্রেমিক বাঙালী রাজা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	৯৫
সোনারগাঁ আর পানাম নগর	১০১
বারো ভুঁইয়া	১০৯
বর্গী এলো দেশে	১১৫

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব	১২১
বাঙলার ওপরে ইংরেজদের লোভের কারণ	১৩৩
ঢাকার গৌরব মসলিন	১৩৭
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	১৪৭
বাঙলায় গণবিদ্রোহের শুরু	১৪৯
ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	১৫৩
রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ : "জাগো বাহে, কোনঠে সবায়"	১৫৭
ওয়াহাবী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ ও তাঁর কেল্লা	১৬১
ফরাজী আন্দোলন	১৬৭
সন্দ্বীপ বিদ্রোহ	১৬৯
সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিধু আর কানু	১৭১
কোল বিদ্রোহ	১৭৭
পাগলাই ধুম	১৮১
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৩
নীল বিদ্রোহ ও তার নায়কেরা	১৮৯
বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবী দল, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী	২০৯
বিপ্লবী আন্দোলন ও মাষ্টারদা সূর্যসেন	২১৫
বাঙলার বাউল	২২১
শেষ কথা	২২৩
বাঙলার ইতিহাসের আনুমানিক কালপঞ্জী তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী	২২৫-২২৭

এই বইয়ে ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুপারিশকৃত ও
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমোদিত প্রমিত বানান বিকল্পসহ ব্যবহার করা হয়েছে

https://nagorikpathagar.org

কাপড়ের ভাঁজে ইতিহাস

তুমি কি জানো এই কাপড়টার নাম?– পরনের শার্টটা দেখিয়ে বাবা আমার কাছে জানতে চাইল।

রোকেয়া সরণি দিয়ে আমরা ধানমণ্ডির দিকে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি জানি না। বাবা-মা বাইরে যাচ্ছে শুনে আমিও সঙ্গী হয়েছি। একসাথে বেড়ানোর মজাই আলাদা। আমি গাড়ীতে বসে ঢাকার রাস্তার জ্যাম দেখছি। কিছুক্ষণ আগে সিগন্যালে গাড়ী দাঁড়াতেই একসাথে কয়েকজন গাড়ীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেউ গাড়ীর কাচ মুছছে; কেউ ফুল, কেউ চকোলেট বিক্রি করতে চায়; কেউ-বা শুধুই ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময়টা আমার খুব খারাপ লাগে।

আমি বাবাকে কালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের দেশটা এত গরীব কেন? বাবা কোনো উত্তর দেয়নি। বড় হলে সবাই শুধু হোঁৎকা হয়ে যায়। আমার এত খারাপ লাগে, ওদের কেন লাগে না? আমি বড় হলে, এমন কাজ করবো যেন আমার দেশ

https://nagorikpathagar.org

এত গরীব না থাকে। আজকে হঠাৎ বাবার প্রশ্নটা শুনে অদ্ভুত লাগলো। মাও দেখলাম বাবার এই প্রশ্ন শুনে অবাক। শার্টের কাপড়ের নাম জেনে কী হবে?

– জানি না। আমি বললাম।

তবে বাবার এই শার্টটা অন্যরকম। কেমন যেন জাল জাল। ফাঁকা ফাঁকা। তেমন ঠাস-বুনন না। হাত দিয়ে দেখলাম একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কেমন যেন কুঁচকে কুঁচকে যায়।

– এটাকে বলে লিনেন। আমি এই কাপড়টা পছন্দ করি। লিনেন আমাদের দেশে তৈরী হয় না, আমরা খুব একটা পরিও না লিনেনের কাপড়। অথচ দেখো, এই লিনেনের সাথে বাঙলাদেশের ভাগ্য একসময় জড়িয়ে গেল। লিনেনের সাথে আমাদের দেশের গরীব হয়ে যাওয়ার ইতিহাসের, বঞ্চনার ইতিহাসের একটা যোগসূত্র আছে। আমাদের দেশ এরকম গরীব ছিল না।

– আমরা তাহলে এত গরীব ছিলাম না? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি। লিনেনের সাথে আবার আমাদের গরীব হওয়ার কী সম্পর্ক? আমার কেমন অদ্ভুত লাগে।

– আমাদের দু-তিনশ বছরে নিঃস্ব আর দরিদ্র বানানো হয়েছে।

– আমার এখন অবাক হবার পালা। কারা আমাদের গরীব করলো? বাবার দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাই।

– এছাড়াও ৬৪৭ সালের পর থেকে প্রায় একশো বছর বাঙলাতে দারুণ অনাচার হয়েছিল। এই সময়টাকে বলে মাৎস্যন্যায়। সে এক গভীর অরাজক অবস্থা। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, শক্তির উন্মত্ততা, রাজ্য আছে রাজা নেই– মানুষের ধন-প্রাণ বিপন্ন।

https://nagorikpathagar.org

এই মাৎস্যন্যায় আমাদের প্রথম ক্ষতিটা করেছে, আর বাকিটা করেছে ইংরেজ আর পাকিস্তানীরা; এরপর থেকে আর আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ খুব একটা পাচ্ছি না। বাবা বললেন।

বাবা একটু থামেন। আমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই থাকি।

– কালকে বগুড়া যাবো। দাদুভাই, দিদিভাইকে দেখে আমরা শুরু করবো সেই গল্প। আমরা অনেক জায়গায় ঘুরবো, ঘুরতে ঘুরতে ইতিহাসের অনেক কিছু দেখবো আর গল্প শুনবো। রূপকথার মতো সেই গল্প, বাঙলার গল্প, বাঙালীর গল্প। আর এই গল্পটার শুরু বগুড়াতেই। আমাদের গর্বের, গৌরবের, স্বপ্নের আর বঞ্চনার সেই মহাকাব্যিক গল্প তোমাদের মতো টাট্টু পুটুমদের জানা খুব দরকার।

– টাট্টু পুটুম কী? আমি জানতে চাই।

– কাটুম বড় হলে টাট্টু পুটুম হয়ে যায়। তুমি এখন বড় হয়েছো। তাই তুমি এখন কাটুম না, তুমি টাট্টু পুটুম।

চুপি চুপি বলে রাখি, বাবা আমাকে ছোটবেলায় টাপুস টাপুস বলে ডাকতো, যখন একটু বড় হলাম তখন আমি হলাম কাটুম, আর এখন বাবা হঠাৎ করে আমাকে টাট্টু পুটুম করে দিলো।

https://nagorikpathagar.org

বগুড়ার পথে

আমাদের বগুড়ার যাত্রা শুরু হলো। পথে বাবা আর আমি খুনসুটি করতে লাগলাম।

– তুমি আমার এত বেশি নাম দাও কেন? কিছুদিন পরপর একেকটা নতুন নাম। আমার বন্ধুরা জানলে কিন্তু ওরা হাসাহাসি করবে।

– যাদেরকে মানুষ ভালোবাসে তাদের অনেক নামে ডাকতে পছন্দ করে। যেমন ধরো, যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করেছে তাদের আমরা অনেক নামে ডাকি। এটা ভালোবাসার ডাক। আমরা তাদের বলি মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিসেনা, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিসংগ্রামী। আর আমাদের গ্রামের মানুষরা ডাকতো শুধু ছোট্ট করে 'মুক্তি'।

আমি জানি একটু পরেই বাবা বকবক করে ইতিহাস বলতে শুরু করবে।

– অনেক আগের ইতিহাস আমরা জানি কীভাবে? বই পড়ে? আমি জিজ্ঞেস করি।

https://nagorikpathagar.org

– বই থাকলে তো ভালোই হতো। কিন্তু অনেক প্রাচীন ইতিহাস বইয়ে থাকে না। সেইসব সময়ে তো বই লেখা হতো না। প্রাচীন ইতিহাস জানা খুব কঠিন, বিশেষ করে যদি সেটা অনেক পুরনো হয়। পুরাতাত্ত্বিকেরা অনেক সময় মাটি খুঁড়ে প্রাচীন নগর সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বের করেন, বের করেন তাদের ব্যবহার করা জিনিষ। ব্যবহার করা জিনিষ দেখে ধারণা করা যায় তারা কোন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। সেটা কি পাথরের তৈরী, নাকি লোহার তৈরী। যদি পাথরের তৈরী হয় তবে ধরে নিতে হয় অনেক প্রাচীন সময়ের সভ্যতা সেটা, আর যদি লোহার বা তামার তৈরী জিনিষ হয় তবে সেই সভ্যতা অনেক সমসাময়িক। আর বিশেষ করে তাদের ব্যবহৃত মুদ্রা দেখে অনেক কিছু জানা যায়।

– তার মানে সময় বিচার করা হয় টাকা-পয়সা কী দিয়ে তৈরী সেটা দেখে? আমি অবাক হই।

– প্রাচীনকালে রাজারা নিজেদের নামে মুদ্রা তৈরী করতেন। সেই মুদ্রা হতো সোনা, রূপা বা তামার। এই অঞ্চলে অনেক সময় রাজারা তাদের নির্দেশ তামার পাতে খোদাই করে প্রচার করতেন। সেখানে নিজের নাম, মুদ্রা ছাপানোর সাল উল্লেখ থাকতো, সেটা দেখে অনেক কিছু জানা যায়। আগে তো আমাদের মতো রেডিও-টেলিভিশন ছিল না। তাহলে রাজারা তাদের নির্দেশ কীভাবে মানুষের কাছে পৌছাতেন? রাজারা পাথরের ফলকে আদেশ উৎকীর্ণ করে রাখতেন, সেগুলো থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। অনেক পরিব্রাজক ঘুরতে আসতো, ফিরে গিয়ে তারা তাদের ভ্রমণ কাহিনী লিখে রাখতো। তাছাড়া কাব্য, গান, ধর্মগ্রন্থ– এগুলোর মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। আর ইতিহাসবিদেরা এসব তথ্য-উপাদান অনেক যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন।

https://nagorikpathagar.org

আমি এর মধ্যে বাঙলাদেশের একটা মানচিত্র এঁকে ফেললাম। বাবাকে দেখাতেই বাবা মানচিত্র নিয়ে শুরু করলেন।

– বাঙলাদেশের যে মানচিত্র আমরা আজকে দেখি, বাঙলা বলতে এই ভূখণ্ডকেই বোঝাতো না। বাঙলা ছিল অনেকগুলো জনপদের সমষ্টি, এর মধ্যে বঙ্গ এবং বঙ্গাল দুইটি জনপদের নাম ছিল, অথচ এই দুই জনপদের নামেই সমস্ত দেশটা একসময় পরিচিত ছিল। অন্য জনপদগুলোর নাম ছিল পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট, হরিকেল। জনপদ হিসেবে তৈরী হওয়ার আগে এই অঞ্চলে ছিল কোম (কৌম)। কোম মানে জনগোষ্ঠী। এই কোমগুলোই পরবর্তী সময়ে জনপদের রূপ নেয়। এই সময় থেকেই মিসর, রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সাথে বাঙলার বাণিজ্য হতো। বাঙলা থেকে সুবর্ণ, বিচিত্র সূক্ষ্ম রেশম ও সুতি কাপড়, মশলা ও গন্ধদ্রব্য রপ্তানী হতো।

– সুবর্ণ মানে তো 'সোনা'! আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে বাঙলা থেকে সোনাও রপ্তানী হতো?

– হ্যাঁ, ইতিহাস তো সেটাই বলে। আমরা পরে এ নিয়ে আবার কথা বলব। এখন মূল গল্পে ফিরে আসি। তুমি যদি যে-কোনো দেশের বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস দেখো, তাহলে দেখবে এভাবেই ছোট ছোট গোষ্ঠী থেকে জনপদ এবং পরে সেটা একটা নির্দিষ্ট দেশের রূপ নিয়েছে।

– তার মানে আমরা যে মিরপুরে থাকি, কোম কি এমন কিছু ছিল?

– না, এটাকে কোম বলা যাবে না। কোমের মানুষেরা শুধু এক জায়গায় থাকতো না, একসাথে থাকতো। আমরা মিরপুরের মানুষেরা এক জায়গায় থাকি কিন্তু একসাথে থাকি না। বাবা

https://nagorikpathagar.org

বললো।

– ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা।

– যেমন ধরো, আমাদের পাশের বাড়ীতে কে থাকে আমরা কি জানি? আমরা কি মিরপুরের সব মানুষ মিলে ঠিক করি মিরপুরের জন্য কী করা দরকার? আমরা কি একসাথে শস্য সংগ্রহ করি বা খাবার সংগ্রহ করি? কোমে এ সবকিছুই একসাথে করা হতো। মিরপুরকে তুমি বড়জোর জনপদ বলতে পারো। কোম যখন বড় হয় তখন জনপদ হয়ে যায়। টাপুস টাপুস যেমন বড় হলে কাটুম আর কাটুম বড় হলে টাট্টু পুটুম হয়ে যায়; সেইভাবে কোম বড় হলে জনপদ হয়ে যায়। আর অনেক জনপদ মিলে একটা রাষ্ট্র হয়।

বাঙলায় যখন কোম ছিল তখন তারা কোনোকিছু লিখে যায়নি। সেটা একটা বড় সমস্যা। যারা এই সময় ইতিহাস লিখেছে তারা কোমের অধিবাসীদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতো না। তাদের লেখায় কোম সম্পর্কে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে। আর্যরা এই অঞ্চলের কোমগুলোকে কখনো ম্লেচ্ছ কোম, কখনো পাপ কোম বলে তাচ্ছিল্য করতো। কিরাত, পুলিন্দ, হুন, আভির – এগুলো ছিল বিভিন্ন কোমের নাম। এর মধ্যে একটা ছিল পুণ্ড্র কোম, যা পরে পুণ্ড্রবর্ধন নামে জনপদে রূপান্তর হয়ে বাঙলার প্রথম রাজধানী হয়েছিল।

– ঢাকার নাম তাহলে আগে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল?

বাবা হো হো করে হেসে ওঠে।

– না না। ঢাকা অনেক পরে বাঙলার রাজধানী হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধন বগুড়ার কাছের একটা জায়গা। বগুড়া শহর থেকে

https://nagorikpathagar.org

আট কিলোমিটার দূরে বগুড়া থেকে রংপুর যাওয়ার পথে পড়ে। এখন তার নাম মহাস্থানগড়।

– তাহলে গৌড়, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট এইসব এলাকা কোথায় ছিল? এই নামে তো এখন কোনো জায়গাই নেই।

– পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল বগুড়ার কাছে, কিন্তু রাজ্যটা দক্ষিণ দিকে প্রায় যশোরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হচ্ছে ভোলা, পটুয়াখালী আর বরিশাল। সমতট ছিল মাদারীপুর, লাকসাম, মাইজদী আর কুমিল্লা। সমতট মানে সমুদ্রতটের সমান। এই অঞ্চলটা নীচু ছিল। সোমপুর ছিল জয়পুরহাট। গৌড় ছিল মালদহ, মুর্শিদাবাদ আর রাজশাহীর কিছু অংশ। রাঢ় ছিল নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, যা এখন পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ছিল তাম্রলিপ্ত যা এখন বাঁকুড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, কোলকাতা। আর মুন্সীগঞ্জকে তো আমরা এখনো বিক্রমপুর বলেই ডাকি। হরিকেল ছিল আজকের সিলেট।

বগুড়া যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে আমরা থেমে একটু নাস্তা খেতে খেতে বাবাকে জিজ্ঞেস করি, এই জায়গার কী নাম ছিল আগে?

– এটাকে এখন বলে সিরাজগঞ্জ। পাশেই তুমি পাবে প্রমত্তা যমুনা নদী। এই নদীর অনেক ভাঙা-গড়ার কারণে এখানে কোনোসময় মানুষ স্থির হয়ে বসতি গড়তে পারতো না। তাই এখানে কোনো নগর গড়ে ওঠেনি। আদিকালেও কোনো নগর ছিল বলে মনে হয় না। বাবা বললো।

– নদীর সাথে তাহলে নগর তৈরীর সম্পর্ক আছে?

– অবশ্যই আছে। নদীর পাশেই গড়ে ওঠে জনপদ। যেমন- বুড়িগঙ্গার পাশে গড়ে উঠেছে ঢাকা। করতোয়ার পাশে বগুড়া।

https://nagorikpathagar.org

নদীই যে আগেকার দিনে চলাচলের প্রধান পথ ছিল। নদী দিক বদলায়, তখন সেই নগর শ্রীহীন হয়ে পড়ে। অনেক নদী শুকিয়ে যায়, তখন নগরও তার গুরুত্ব হারায়।

– তাহলে কি বগুড়াও গুরুত্ব হারাবে?

– প্রাচীনকালে হলে অবশ্যই গুরুত্ব হারাতো। তবে এখন তো শুধু নদীপথেই মানুষ যাতায়াত করে না। গাড়ী আছে, প্লেন আছে, রেল আছে। তাই সেই অর্থে হয়তো গুরুত্ব হারাবে না, তবে নদী শুকিয়ে যাওয়াটা বগুড়ার জন্য ভালো হয়নি। তুমি তো প্যারিস দেখেছো, শিন নদী তার পাশ দিয়ে যুগ যুগ ধরে বয়ে যাচ্ছে। নিউইয়র্ক দেখেছো, হাডসন নদীর তীরে। নগরের পাশে নদী থাকলে নগরের পরিবেশ ভালো থাকে। তুমি দেখবে ঢাকাতে অনেকে বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানোর জন্য কথা বলছে, লিখছে, মানববন্ধন করছে। আমরা যদি সতর্ক না হই তাহলে বুড়িগঙ্গাও একসময় মরে যাবে। নদী শুকিয়ে গেলে পানির স্তর নীচে নেমে যায়, ফলে গাছপালা কম জন্মায়। সেটাও আরেক সমস্যা।

– কী সর্বনাশ! আমাদের চোখের সামনে বুড়িগঙ্গা মরে যাবে?

– একদিনে হয়তো মরবে না, ধীরে ধীরে মরে যাবে। তবে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে বুড়িগঙ্গা মরবে না।

– কী করলে বুড়িগঙ্গা মরবে না? আমি জানতে চাই।

– অনেক কিছুই করা যায়। যেমন ধরো, নদীর পাড় দখল করে কোনো কিছু তৈরী না করা, নদীর জল দূষিত না করা, নিয়মিত ড্রেজিং করে নদীপথের নাব্য ঠিক রাখা। তুমি তো দেখেছো, প্যারিসে শিন নদীর পাড় মাইলের পর মাইল বাঁধিয়ে

https://nagorikpathagar.org

রাখা হয়েছে, সেভাবে বাঁধিয়ে রাখলেও নদী রক্ষা পাবে, নদীর সৌন্দর্যও বাড়বে। ছোট-বড় অসংখ্য নদী আর এদের শাখা-প্রশাখা বাঙলার প্রাণ। বাঙলার নদ-নদীই বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক করেছে, এখনো করছে। নদীগুলো বুকে করে পলিমাটি নিয়ে আসে। সেই পলিমাটি দিয়েই আমাদের দেশ তৈরী হয়েছে। তাই বাঙলার বেশিরভাগ ভূখণ্ডই নব্যসৃষ্ট; কোমল ও কমনীয়। এই কমনীয় মাটির উপর দিয়েই ছুটে চলা নদীগুলো উদ্দাম, উচ্ছল। বর্ষায় প্রমত্তা। তখন এ-কূল ভাঙে আবার ও-কূল গড়ে। এইভাবে কত নগর, বন্দর, গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মানুষের কীর্তি ধ্বংস হয়েছে কে জানে! সেই জন্য তো আমাদের পদ্মা নদীর আরেক নামই হয়ে গেছে কীর্তিনাশা। ইউরোপে দেখবে একটা শহর হাজার হাজার বছর টিকে থাকে। আমাদের শহরগুলো অত দিন টেকে না। জলবায়ু আর নদীর গতিপথের কারণে আমাদের নগরগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্পায়ু হয়।

– ঢাকা তাহলে আমাদের রাজধানী হলো কবে থেকে?

– ঢাকা রাজধানী হিসেবে নতুন। আবার তার পরেও বারে বারে এই রাজধানী পরিবর্তন হয়েছে। ধারণা করা হয়, ঢাকা প্রথমে সমতট, পরে বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানেরা ঢাকা অধিকার করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান অনুযায়ী ১৬ই জুলাই, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাকে সুবে বাঙলার রাজধানী ঘোষণা করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে রাজধানীর নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবিতকাল পর্যন্ত এ নাম বজায় ছিল।

এর আগে সম্রাট আকবরের আমলে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল বিহারের রাজমহল। সুবে বাঙলায়

https://nagorikpathagar.org

তখন চলছিল মুঘলবিরোধী স্বাধীন বারো ভুঁইয়ার রাজত্ব। বারো ভুঁইয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঙলাকে করতলগত করতে ১৫৭৬ থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত বার বার চেষ্টা চালানো হয়। এরপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতীকে রাজমহলের সুবেদার নিযুক্ত করেন। তিনি ১৬১০ সালে বাঙলার ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে নেন।

১৬১০ সালে ঢাকা সুবে বাঙলার রাজধানী হলেও সুবে বাঙলার রাজধানী বার বার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার শাহ সুজা রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তর করেছিলেন। শাহ সুজার পতনের পর ১৬৬০ সালে সুবেদার মীর জুমলা আবার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন। এরপর বেশ কিছুকাল ঢাকা নির্বিঘ্নে রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করার পর ১৭১৭ সালে সুবেদার মুর্শিদ কুলী খান রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। এরপর ঢাকায় মুঘল শাসনামলে চলতো নায়েবে নাজিমদের শাসন। ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত এভাবেই নাজিমদের শাসন চলছিল।

– নায়েবে নাজিম আবার কী?

– অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বাঙলার ভিতরে ও বাইরের বিদ্রোহ ঠেকাতে এবং বিশেষ করে আফগানদের আক্রমণের আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে দূরের এলাকা শাসনে দিল্লীর বাদশাহকে সহায়তা করতে নায়েবে নাজিমের (সুবাহদারের প্রতিনিধি) পদ সৃষ্টি করা হয়। তারা ছিলেন মূলত স্বাধীন শাসক। এদের শাসন আমলকেই নবাবী শাসন বলা হয়।

ব্রিটিশরা রাজধানী হিসেবে কোলকাতাকে নির্বাচিত করলে ঢাকার গুরুত্ব আবারো কমতে থাকে। শেষে বাঙলাদেশ স্বাধীন

https://nagorikpathagar.org

হওয়ার পরে ঢাকা আবার একটি দেশের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পায়।

আমাদের যাত্রাবিরতি শেষ। আবার রওনা হলাম আজকের বগুড়া আর প্রাচীনকালের পুণ্ড্রবর্ধনের দিকে। বাবা আবার বলতে শুরু করে।

– বাঙলাদেশের কথা প্রথম পাওয়া যায় গ্রীক ইতিহাসবিদদের লেখায়। আলেকজান্ডার যখন সেই খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ সালের দিকে ভারত জয় করতে আসেন তখন তারা এই অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গারিডি নামে এক রাজ্য ছিল বলে জেনেছিলেন। সেই রাজ্যটি ছিল প্রাচীন বাঙলা। তখনো সারা ভারতে কোনো একক রাজ্য ছিল না। তবে গঙ্গারিডি ছিল এক শক্তিশালী রাজ্য। আলেকজান্ডার গোপনে খবর নিয়ে জেনেছিলেন, গঙ্গারিডি রাজ্যের চার হাজার হাতীসহ সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী আছে। ধারণা করা হয়, গঙ্গারিডির এই বিশাল সামরিক শক্তি দেখে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারও ভারতের ভিতরে আর ঢোকার সাহস পাননি। এর মধ্যেই এক যুদ্ধে এক ছোট রাজ্যের হস্তী বাহিনীর হাতে আলেকজান্ডার নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। শুধু নাস্তানাবুদ? যুদ্ধে মারাত্মক আহতও হয়েছিলেন এই বিশ্বজয়ী। তাই হস্তী বাহিনীর কথা শুনে একটু ভয় পাওয়ারই কথা। আলেকজান্ডার ফিরে যাওয়ার পর গঙ্গারিডি রাজ্যের কী হয়েছিল সেটা জানা যায় না। তবে অনেকে বলে, ওটা গঙ্গারিডি নয়, ওটা হবে গঙ্গাহৃদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, "ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি, বৎসলতা মূর্তিময়ী গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।" গঙ্গা হৃদয়ে যার – এই অর্থে গঙ্গাহৃদি।

– তাহলে সেই গঙ্গাহৃদি কোথায় ছিল? আমি জিজ্ঞেস করি।

– যেহেতু এটা অনেক প্রাচীন রাজ্য ছিল, তাই সেসব সময়ের

https://nagorikpathagar.org

নিদর্শন তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে কেউ কেউ ধারণা করেছিল নরসিংদী শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে বেলাবো উপজেলার ওয়ারী বটেশ্বর সেই গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বাঙলাদেশের সর্বপ্রাচীন জনপদ। এর আরেকটি নাম আছে, "অসম রাজার গড়"। গবেষকেরা ধারণা করেন যে এটি প্রায় তিন হাজার বছর আগের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। এখানে প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রাসহ অনেক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক দাবী করেছেন, ওয়ারী বটেশ্বর ছিল সেই প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল। অনেক প্রত্নবিদ মনে করেন এটা লৌহিত্য সভ্যতার কোনো একটা নগর।

– লৌহিত্য সভ্যতা আবার কী?

– এটা খ্রিষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগের এক বঙ্গ সভ্যতা। এই সভ্যতায় স্বল্পমূল্যের পাথরের গুটিকা তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল। আর এই পাথরের গুটিকার জন্য লৌহিত্য সভ্যতা বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এর বেশী কিছু এখনো জানা যায়নি। এটা হয়তো পরে জানা যাবে।

– তাহলে গঙ্গাহৃদি থেকে আমরা বাঙালী হলাম কীভাবে?

– একটা জাতি দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়ে ওঠে। এখনো আমরা গড়ে উঠছি। বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিলেন প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অষ্ট্রাল। আদি অষ্ট্রাল বলার কারণ হলো, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল রয়েছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের মিলও রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

– রক্তের মিল মানে?

– রক্তের গ্রুপ দেখে বলা যায় কারা কোন জাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমাদের আর অষ্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের রক্তের গ্রুপ এক রকম। একসময় আদি-অষ্ট্রালদের বসতি উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইষ্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগে তারা ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌঁছায়।

– তার মানে অষ্ট্রেলিয়ায় আসলে এই ভারতবর্ষের মানুষ বসতি গেড়েছে? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– হুঁ, ঠিক তাই। বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ওই গোষ্ঠীর লোক।

হিম যুগের পর থেকে এই ভূখণ্ড কখনোই জনশূন্য কিংবা মনুষ্যবিহীন ছিল না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, এখানেও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোঁদ, বাউড়ী, কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, সাবর, পুলিন্দা, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, রাজবংশী সমুদয় জাতিসমষ্টিই বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভাষার ও আকৃতির মূলগত ঐক্য হতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় জাতি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানবগোষ্ঠীর সাথে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের চেহারার এবং ভাষার মিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের বলা হয় অষ্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক।

– তার মানে আমরা আর অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ জাতভাই?

https://nagorikpathagar.org

– হ্যাঁ। তবে আদিম অষ্ট্রেলিয়ান। এখন যে সাদা চামড়ার মানুষ অষ্ট্রেলিয়ায় দেখো তারা অষ্ট্রেলিয়ান নয়। এরা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছ থেকে দেশটাকে কেড়ে নিয়েছে।

– দেশ তাহলে কেড়ে নেওয়া যায়?

– হ্যাঁ, যায়। অনেক দেশ তাদের আসল অধিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন আমেরিকা।

– আমেরিকাও তাহলে কেড়ে নেওয়া দেশ?

– হ্যাঁ, তাই। বাবা বলেই চুপ করে গেল। মনে হলো বাবা এই কেড়ে নেওয়ার বিষয়টা পছন্দ করেনি।

বাবা আবার বলতে শুরু করে।

– তবে বাঙালী জাতির অন্তত দশ হাজার বছরের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস ও শেকড় রয়েছে। বাঙলাদেশের পশ্চিমে আছে পশ্চিম বাঙলা, সেখানে মাটি খনন করে পাওয়া গেছে প্যালিওলিথিক ও মাইক্রোলিথিক অস্ত্রশস্ত্র। যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায়, বাঙালীরা যোদ্ধা জাতি ছিল। সিন্ধু উপত্যকা থেকে আর্যরা আসতে চেয়েছিল বঙ্গদেশেও। কিন্তু আদি বাঙালীদের কাছে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফলে বাঙলা অঞ্চলের মানুষের প্রতি আর্য বা আরিয়ানদের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তারা নিজেদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল, "বাঙলা অঞ্চলে কেউ যেও না, যদি ভুলে চলে যাও তো এসে পুনোষ্টম নামে একটা পূজা করবে, তাহলেই পবিত্র হবে আবার।"

https://nagorikpathagar.org

বগুড়া থেকে ইতিহাস পাঠ

আমরা বগুড়াতে পৌঁছে গেছি। দাদুভাই আর দিদিভাইয়ের সাথে দেখা হলো। দাদুভাই আর দিদিভাইয়ের কাছে বাবার নামে আমার অনেক নালিশ করার আছে। আমি বাসায় ঢুকেই দিদিভাইকে নালিশ দিই।

– তোমার ছেলেকে একটু বকে দাও। তোমার ছেলে খালি আমার পিছনে লাগে।

দিদিভাই শুধু হাসে।

আজকের দিনটা বিশ্রাম নেবো আমরা। কালকে শুরু হবে বাঙলার প্রাচীন রাজধানী দেখা। আমরা কালকে যাবো সেই প্রাচীনকালের পুণ্ড্রবর্ধন আর আজকের মহাস্থানগড়। বগুড়া শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে রংপুরের পথে।

পরদিন আমরা চলেছি পুণ্ড্রবর্ধনের পথে। খুব শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

https://nagorikpathagar.org

– পুণ্ড্র মানে কী সেটা জানো? বাবা জানতে চায়।

– না তো? কী মানে? আমি বলি।

– পুণ্ড্র মানে আখ। তাই পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর মানে আখের নগর। এই অঞ্চলে এখনো ভালো আখ হয়।

– আখের নামে নগর। আমি মজা পেয়ে বলি।

– হ্যাঁ, শুধু এটাই নয়, বাঙলার আরেক রাজধানী গৌড় এসেছে 'গুড়' থেকে।

– ধুর, তুমি আমার সাথে ফান করছো।

– মোটেই এটা ফান নয়।

বাবা দেখলাম বেশ সিরিয়াস। তাহলে এটা ফান নয়?

– না, ফান নয়। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কিছুটা আবিষ্কার করা হয়েছে, এখনো অনেকটাই মাটির নীচে। মাটি খুঁড়ে যেটুকু বের করা হয়েছে তার মধ্যে আছে অপূর্ব নগরপ্রাচীর, কেন্দ্রীয় মন্দির, আর নগরের প্রাসাদগুলো। মহাস্থানগড়ের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এমন শত শত স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ। মহাস্থানগড়ের কাছেই আছে 'বেহুলার বাসরঘর' নামের আরেকটা স্থাপনা। তবে ওটাকে ভুল করে বেহুলার বাসরঘর বলা হয়, ওটা মোটেই বাসরঘর ছিল না। ওটা ছিল একটা ছোট বৌদ্ধবিহার। বৌদ্ধবিহার মানে বৌদ্ধদের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়। এত আগে এমন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। এই বিহারগুলো মোটামুটি একই রকম। একটা কেন্দ্রীয় মন্দির আর তাকে ঘিরে চারিদিকে ছোট ছোট ঘর। এই ঘরগুলোতে ছাত্র আর শিক্ষকেরা থাকতো। জয়পুরহাটের পাহাড়পুর আর কুমিল্লার ময়নামতিও বিখ্যাত

https://nagorikpathagar.org

বৌদ্ধবিহার।

– আবারও এখানে লেখাপড়া? আমি একটু দুষ্টুমি করার চেষ্টা করি।

বাবা সেকথা কানে তোলে না। বলতে থাকে।

– অনেকে মনে করে আমরা জাতি হিসেবে অনগ্রসর। কিন্তু তারা যদি জানতো আমরা কত আগে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিলাম! সম্রাট অশোকের রাজত্বের সময় খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৯-২৩২ সালে পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। মৌর্য রাজবংশের পরে বাঙলা শাসন করে গুপ্ত রাজবংশ। গুপ্ত নামটা শুনে বাঙালী বাঙালী মনে হচ্ছে না? বাবা জিজ্ঞেস করে।

– হ্যাঁ, তাই তো। আমি বলি।

– ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন, গুপ্ত রাজবংশের আদিনিবাস বাঙলাদেশ। গুপ্ত রাজবংশেরও প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। গুপ্ত শাসনামলে বাঙলার অর্থনৈতিক উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছায়। তখন মুদ্রা ছিল সোনা আর রূপার। এই সময় নালন্দা বিহার তৈরী হয়। নালন্দা ছিল সে-সময়ের অক্সফোর্ড। চীন থেকে হিউএন সাং এই নালন্দায় পড়তে এসেছিলেন। গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধিই এর পতনের কারণ হলো। একসময় সবাই বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিলো। অলস আর অকর্মণ্য হয়ে উঠলো সবাই। এই সময় হুড়মুড় করে হুন নামে এক পাহাড়ি জাতি এসে পঞ্চম শতকের শেষ দিকে গুপ্তদের সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিলো। গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বাঙলাতেও দুটো স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটলো, বঙ্গ আর গৌড়। হুনরা আমাদের এই একটা উপকার করে দিলো। বাবা হাসতে হাসতে বললো। আমরা প্রথম স্বাধীন

https://nagorikpathagar.org

দেশ পেলাম, হোক না দুই টুকরো, তাও তো স্বাধীন বাঙলা।

গুপ্তদের পতনের পরে, একদিকে রাজত্ব করেছিল ধর্মাদিত্ত, গোপচন্দ্র আর সমাচার দেব, আরেক দিকে মহারাজ শশাঙ্ক। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা আর তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, এখন মুর্শিদাবাদের কানসোনা। শশাঙ্ক ছিলেন একজন যোগ্য রাজা, যোগ্য দেশনায়ক, জ্ঞানী রাজনীতিক এবং মস্ত বড় সামরিক নেতা। তাঁর সময়েই গৌড় এক শক্তিশালী স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে সর্বভারতীয় গুরুত্ব পায়। শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি, উড়িষ্যা, মগধ জয় করে বাঙলার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। পশ্চিমে রাজ্যের সীমানা বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপ রাজাও শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। শশাঙ্ক উত্তর-ভারত জয় করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। উত্তর-ভারতে তখন দুইটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল; একটার নাম ছিল থানেশ্বর, অন্যটা কান্যকুব্জ। কান্যকুব্জ এখন কনৌজ, বারানসীর পাশে একটা রাজ্য। আর থানেশ্বর চণ্ডীগড়ের কাছে একটা শহর।

তুমি যদি এখন ইণ্ডিয়ার ম্যাপটা দেখো তাহলে দেখবে শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যের সীমানা বারানসী থেকে সোজা উত্তর দিকে বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। যারা আজকে আমাদের ভেতো বাঙালী বলে পরিহাস করে, তারাই একসময় বাঙলার রাজাকে খাজনা দিতো। বাবা বললো।

– শশাঙ্ক উত্তর-ভারত জয় করার চেষ্টা করেছিল বললে, তাহলে শশাঙ্ক শেষ পর্যন্ত পারেনি?

– সেটাই তো মজা। বাবা বললো। মালবের রাজা দেবগুপ্ত ছিলেন শশাঙ্কের বন্ধু। মালব রাজ্যটা ছিল এখনকার ভুপালের ওখানে। কথা ছিল শশাঙ্ক আর দেবগুপ্ত একসাথে কান্যকুব্জ আর থানেশ্বর আক্রমণ করবেন। কিন্তু শশাঙ্ক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর ভারতে পৌঁছানোর আগেই দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ

https://nagorikpathagar.org

জয় করে ফেলেন। অতি উৎসাহে শশাঙ্কর জন্য অপেক্ষা না করেই দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে দেবগুপ্ত থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের কাছে পরাজিত এবং নিহত হন। এর মধ্যে শশাঙ্ক তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছে যান, তিনি রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হয়েও, দেবগুপ্তের মৃত্যুতে সম্ভবত শশাঙ্ক তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে আর অগ্রসর না হয়ে বাঙলায় ফিরে আসেন।

আমি বাবার দিকে তাকাই।

– শশাঙ্ক মানে কী, জানো? বাবা জিজ্ঞেস করলো।

– আমি তো শশাঙ্ক মানে জানি না। এটার আবার মানে আছে নাকি?

– শশাঙ্ক মানে চাঁদ। বাবা বলে। শশাঙ্ক ছিলেন বাঙলার প্রথম সার্বভৌম রাজা। তবে শশাঙ্ক কিন্তু দুষ্টও ছিল।

– কেমন দুষ্ট?

– শশাঙ্ক খুব বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিল। সে-ই প্রথম নালন্দা ধ্বংস করে। বুদ্ধগয়ায় যেই বোধিবৃক্ষের নীচে গৌতম বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষও ধ্বংস করে। শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কথা হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

– একটু আগেই বললে, যোগ্য রাজা আবার বলছো দুষ্ট, এটা কেমন কথা?

– পৃথিবীতে শুধু ভালো আর শুধু খারাপ মানুষ কম। সবাই ভালো আর মন্দের মিশেল। আমাদের চেষ্টা করতে হয় আমাদের মন্দ প্রবৃত্তিগুলোকে শাসন করার। এভাবেই আমরা

https://nagorikpathagar.org

'মানুষ' হয়ে উঠি।

আমরা এখন আরেকটা জায়গায় যাবো। নাম ভাসু বিহার। এখানেও অনেক দেখার জিনিষ আছে। বাঙালীরা পুণ্ড্রবর্ধনের পাশেই আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন ভাসু বিহার নামে। বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৯-৬৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। এই ভাসু বিহার ছিল আলোকোজ্জ্বল, অনেক দূর থেকে এর চূড়ার আলো দৃশ্যমান হতো। আর প্রায় ৭০০ ছাত্রকে দেখেন তিনি এখানে। ছাত্রাবাস ছাড়াও কিছুদিন আগে ছাত্রদের রন্ধনশালা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কথা হিউয়েন সাং বলেছিলেন। পাল আমলে এই বিহার তার গরিমার উচ্চশিখরে পৌঁছায়।

ভাসু বিহার এখন শিবগঞ্জ উপজেলাতে। মহাস্থানগড় থেকে চার কিলোমিটার দূরে। এটা ছিল বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরী হয়েছিল শশাঙ্কের রাজত্বের পরে, পাল রাজাদের সময়ে। কিন্তু এখানে আছে একটা মজার জিনিষ। সুসং দীঘি। এটা মহারাজ শশাঙ্ক তৈরী করেছিলেন। লোকেরা শশাঙ্ককে সুসং বানিয়ে ফেলেছে। বলে বাবা হো হো করে হেসে উঠলো।

আমিও হাসলাম। একটু দূরে একটা বড় স্তূপ। বাবা বললো, এটা সম্রাট অশোক তৈরী করেছিলেন। কথিত আছে, এখানে গৌতম বুদ্ধ এসেছিলেন এবং বিশ্রাম নিয়েছিলেন। শশাঙ্কর আমলেই বাঙলা একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে সর্বভারতীয় পর্যায়ে আবির্ভূত হয়। সুনির্দিষ্ট রাজকর্মচারী প্রথা প্রচলিত হয়। বাঙলা তার শক্তি আর ঐশ্বর্য নিয়ে জয়যাত্রা শুরু করে, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাঙালীরা আধিপত্য বিস্তার করে, তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে বাঙালীর সমুদ্রযাত্রা চলতো। কামরূপ, কনৌজ আর থানেশ্বরের মতো প্রবল প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করে শশাঙ্ক সগৌরবে রাজত্ব করেন। দুর্ভাগ্য,

https://nagorikpathagar.org

শশাঙ্কর মৃত্যুর পরে তাঁর মতো নেতা আর হলো না। বাঙলার গৌরব আস্তে আস্তে নষ্ট হতে শুরু করলো। ঠিক এই সময় হিউয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধনে আসেন। তাঁর লেখায় বাঙলার সমৃদ্ধির কথা ফুটে ওঠে। তিনি লিখেছিলেন, "এই অঞ্চল সমৃদ্ধ ও জনবহুল। প্রতি জনপদে সরোবর, পুষ্পোদ্যান ও বিরামকানন শোভিত; ভূমি আর্দ্র ও সমতল; শস্যসম্ভার প্রচুর; জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদু; জনসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

– জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে যে বাঙালীরা শ্রদ্ধাশীল ছিল সেটা কীভাবে বোঝা গেল? আমি জানতে চাইলাম।

– খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। বাবা বললো। সে সময় নালন্দা ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। তাই তো সেখানে পড়তে এসেছিলেন হিউয়েন সাং। সেখানে অধ্যক্ষ কে ছিলো জানো? শীলভদ্র। শীলভদ্রের ছাত্র ছিলেন হিউয়েন সাং। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের বাঙালী। একটা জাতি জ্ঞানে, শিক্ষায় অনেক অগ্রসর না হলে শীলভদ্রের মতো জ্ঞানী বাঙালী হঠাৎ করে জন্ম নিতে পারে না। তুমি যেমন এখন দেখবে না, হঠাৎ করে একজন বাঙালী বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। অনেক ছোট ছোট দেশের বিজ্ঞানীরা নোবেল প্রাইজ পেলেও বাঙালী বিজ্ঞানীরা পায় না, কারণ এখন বাঙলাদেশে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য, বিজ্ঞান চিন্তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকলো না। একের পর এক অক্ষম রাজা এসে শশাঙ্কের সব অর্জন শেষ করে দিলো। এর মধ্যে কনৌজ রাজ যশবর্মা গৌড় আক্রমণ করে গৌড়ের ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিলো। এরপর শুরু হলো অরাজকতা। এমন গভীর অরাজকতা কেউ দেখেনি। কেউ কাউকে মানে না। কোনো রাজা নেই, রাজ্য নেই,

https://nagorikpathagar.org

...kpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

শৃঙ্খলা নেই, ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, শিক্ষা-দীক্ষা কিছু নেই। বাহুবলই একমাত্র বল। সমাজ ক্রমাগত ভূমিনির্ভর হতে থাকলো। কৃষিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হয়ে পড়লো গ্রামকেন্দ্রিক। এই অবস্থা চললো একশো বছর। এই দুর্ভাগা সময়ের নাম মাৎস্যন্যায়।

– মাৎস্যন্যায় মানে কী?

– মাছের ন্যায়, মানে বড় মাছ ছোট মাছ খাবে সেটাই মাছের জগতের ন্যায়। এমন বিচার মানুষের সমাজে চলে না।

– কেন চলে না?

– কারণ মানুষ মাছ নয়, পশু নয়। মানুষ চিন্তা করতে পারে। মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, মানুষ সভ্যতা গড়তে পারে। মানুষকে তাই দায়িত্ববান হতে হয় যারা দুর্বল তাঁদের প্রতি। এই সময়ে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এটাই হচ্ছে সেই সময় যখন আমরা জাতি হিসেবে পিছিয়ে পড়লাম। একশো বছর কম সময় না। এই একশো বছরে সবাই যখন এগিয়ে গেল, আমরা তখন হাজার বছর পিছিয়ে পড়লাম। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

– কিন্তু এই অবস্থার জন্য তো কেউ দায়ী না।

– যোগ্য নেতা না থাকলে এমনই হয়। এই একশো বছরের উৎপীড়ন আর বিশৃঙ্খলায় ক্লান্ত হয়ে সবাই মিলে গোপাল দেব নামে একজন প্রবীণ জ্ঞানী লোককে বাঙলার সিংহাসনে বসালো। গোপাল দেব কিন্তু রাজবংশীয় কেউ ছিলেন না। নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ। আমাদেরই মতো, কিন্তু বিচক্ষণ এবং দেশপ্রেমিক। তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত পাল বংশ। এই পাল বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টম শতকের

https://nagorikpathagar.org

মধ্যভাগে। এঁরা রাজত্ব করে চারশো বছর একটানা। পাল বংশই একমাত্র খাঁটি বাঙালী লক্ষণযুক্ত রাজবংশ। গোপাল দেবের আদিনিবাস ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে। গোপাল দেবের বিচক্ষণ শাসনে বাঙলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোপালের ছেলে ধর্মপাল। তাঁর সময়ে বাঙালীর কীর্তিকথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রকৃত অর্থেই বাঙলা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

– বাঙলা সাম্রাজ্য মানে?

– সাম্রাজ্য খুব একটা ইতিবাচক শব্দ নয়। তবুও ধর্মপাল অবাধে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। জয়পুর, পাঞ্জাব, আফগানিস্তানের কিছু অংশ, এমনকি নেপালও জয় করেছিলেন। তার মানে গৌড় এক বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। যদিও বিজিত রাজ্য বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করলে ধর্মপাল সেই রাজাকেই তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিতেন এবং সকলেই প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্য চালনার অনুমতি পেতো। এখানে ধর্মপালের সূক্ষ্ম রাজবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ গৌড়ে বসে নেপাল রাজ্য সামলানো সহজ কাজ নয়।

– তুমি যে এত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বললে এগুলো কিসের মুদ্রায় হতো? সোনা-রূপায়?

– সোনা-রূপায় তো হতোই, পাশাপাশি চলতো কড়ি।

-"কড়ি" মানে সমুদ্রের কড়ি? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– হ্যাঁ, ঠিক তাই।

https://nagorikpathagar.org

আমি এটা শুনেই পাশের ঘরে রাখা কক্সবাজার থেকে আনা এক মুঠ কড়ি এনে বললাম, তাহলে তো আমি এখন ধনী। বাবা হো হো করে হেসে বললো, এটার নাম হচ্ছে সিপ্রিয়া টাইগ্রিস। মানে এই কড়ির গায়ে বাঘের মতো ফোঁটা ফোঁটা আছে। এটা দিয়ে কোনোকিছু কেনা যেতো না।

– তাহলে?

– যে কড়ি দিয়ে কেনা যেতো সেটা সম্পূর্ণ সাদা ছিল। এর বৈজ্ঞানিক নাম সিপ্রিয়া মোনেটা। এটা পাওয়া যেত মালদ্বীপে। সেখান থেকেই জাহাজ বোঝাই হয়ে আমাদের কড়ির টাকা আসতো। রাজারা কি বোকা ছিল যে কক্সবাজারের সমুদ্র তীরের কড়ি দিয়ে মুদ্রা বানাবে?

– তাহলে একটা কড়ি দিয়ে কী কেনা যেতো?

– ১২৮০টা কড়ি দিলে একটা রৌপ্য মুদ্রার সমান দাম হতো।

– একটা রৌপ্য মুদ্রায় কতটা রুপা থাকতো?

– ১০.৪ থেকে ১০.৮ গ্রাম পর্যন্ত। বাবা বলে।

– ১২৮০ এই সংখ্যাটা কেন? এটা আবার কেমন হিসাব?

– এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছ। এটা এসেছে আমাদের প্রাচীন গণনা পদ্ধতি থেকে। তুমি এবার হিসাব করবে।

– আবার অঙ্ক? তুমি এই সুযোগে আমাকে অঙ্ক শিখাবে? আমি রাগের ভঙ্গিতে বলি।

– হ্যাঁ, শেখো। তবে শিখলে মজা পাবে, পস্তাবে না। ৪টায় এক গণ্ডা বা হালি বলি যেটাকে, ২০ গন্ডায় ১ পণ আর ১৬

https://nagorikpathagar.org

পণে এক টাকা। তাহলে কত হলো দেখো। ১৬ x ২০ x ৪= ১২৮০।

– বাহ, তাই তো, খুব মজার তো! আমি বলি।

– এই ১৬ পণ থেকেই এসেছে ষোল আনা। ষোল আনায় এক টাকা। বাবা বলে।

– ও আচ্ছা, তাই বলো। আমি তো বুঝতেই পারতাম না, এই ১৬ আনা কোথা থেকে আসলো। আচ্ছা এই কড়ির টাকা কি শুধু আমরাই ব্যবহার করতাম? আমি বলি।

– নাহ। এটা সেই সময় আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সব জায়গাতেই চলতো। সেই সময় কড়িতেই দাস ব্যবসা চলতো, মানে দাস কেনাবেচা হতো। এই কড়ির কেন্দ্র ছিল হল্যান্ড আর লন্ডন। তোমাকে আরো একটা মজার কথা বলি। বাঙলাতেও কড়ির ব্যবসায়ী বা মহাজন ছিল, তাদের সম্প্রদায়ের নাম ছিল "পোদ্দার"। এরাই বাঙলার প্রথম যুগের ব্যাংকার। প্রচুর টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো কিন্তু সেই টাকার বা কড়ির মালিক তাঁরা ছিলেন না, মালিক ছিলেন গোত্রপতি বা রাজা বা জমিদারেরা। এই থেকেই পরের ধনে পোদ্দারি বাগধারাটা এসেছে।

– বাহ, তুমি এই গল্প বলতে বলতে তো পড়িয়েও ফেললে। আমি তো পড়তে বসিনি এখন। কপট রাগ দেখাই আমি।

https://nagorikpathagar.org

চর্যাপদ বাঙলার প্রাচীন কাব্য

পাল আমলে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের বিকাশ হয়। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ধর্মপালের সময়েই তৈরী হয়। এই সময় লেখা হয় প্রথম বাঙলা কাব্য, চর্যাপদ। চর্যাপদ লিখেছিলেন অনেক কবি। তাঁদের নামগুলো সব অদ্ভুত। যেমন লুই পাদ, কাহ্ন পাদ, কুক্কুরি পাদ, ভুসুকু পাদ। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন বৌদ্ধ। আমরা যাবো এবার যুগীর ভিটা দেখতে।

একটা চমৎকার জলাভূমি পার হয়ে এলাম। অনেক শাপলা ফুটে অপূর্ব লাগছে। অবশেষে দেখা পেলাম সেই 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'র কবিদের। একটা অনেক প্রাচীন বাড়ী। কেউ মনে হয় যত্নটত্ন করে না। একটু হতাশ হলাম যুগীর ভিটা দেখে।

একটা জায়গায় কয়েকটা মন্দিরের মতো ঘর। সেখানে গাড়ি থামিয়ে বাবা বললো, এটা হচ্ছে যোগীর ভিটা। এখানে কয়েকটা সমাধি আছে। কথিত আছে, এগুলো চর্যাপদের কবিদের কবর। চর্যাপদের সময় কিন্তু বাঙলা ভাষা এখনকার মতো ছিল না।

https://nagorikpathagar.org

– কেমন ছিল তাহলে? আমি অবাক হলাম।

– সেই বাঙলা বুঝতে হলে তোমাকে অনুবাদ করে নিতে হবে। বাবা হাসতে হাসতে বললো।

– তুমি বলতে পারবে সেই বাঙলা? আমিও হাসতে হাসতে বলি।

– আমি চর্যাপদের বাঙলা বলতে পারবো। যেমন ধরো, চর্যাপদের একটা বিখ্যাত পদ "আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী"। মানে বুঝলে?

– না তো। বুঝলাম না।

– মানে হচ্ছে, নিজের শরীরের মাংসই হরিণের শত্রু। মাংসের জন্যই হরিণ মারা হয়। তাহলে মাংসই শত্রু হলো, তাই না? এটা লিখেছিলেন ভুসুকু পাদ।

যোগীর ভিটা যাওয়ার রাস্তাটা ছিল সরু আর ভাঙাচোরা। বেহুলার বাসরঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। আমরা যোগীর ভিটায় যাওয়ার আগে বেহুলার বাসরঘরে থেমেছিলাম। বাবা বলতে থাকে।

এই বেহুলা ছিল চাঁদ সওদাগরের ছেলে লক্ষিন্দরের বউ। চাঁদ সওদাগর ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত বণিক। নানা দেশে যেতো চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য জাহাজ। চাঁদ সওদাগর যেখানে থাকতেন সেই নগরের নাম ছিল চম্পাই নগর।

– তাহলে বেহুলা-লক্ষিন্দরের গল্প বানানো না? আমি জানতে চাই।

https://nagorikpathagar.org

– না, বানানো গল্প না। কিছু কিছু বিষয় হয়তো বাড়িয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু এই মানুষগুলো একসময় এখানেই থাকতো, আমাদের মতোই এই রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। চম্পাই নগর ছিল খুব সমৃদ্ধ একটা বন্দর।

– ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন। দেবপালের সুশাসনে বাঙলা নতুন প্রাণ ফিরে পায়। দেবপালের দুই মন্ত্রী ছিলেন, দর্ভপাণি আর কেদার মিশ্র। এই তিনজনের বোঝাপড়া খুব ভালো ছিল। তাঁর সময়ে একদিকে চলতে থাকে সাম্রাজ্য বিস্তার, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি। বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হতে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কূপমণ্ডূকতা কিংবা ভাগ্যনির্ভরতা থেকে বাঙালী বেরিয়ে আসে। বহু দেশের সংস্পর্শ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ বাঙালী-জীবনে এনে দেয় শক্তি, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস।

– আমরা তো তাহলে অনেক ভালো ছিলাম।

– তা তো ছিলামই। সব ভালো যেমন একসময় শেষ হয়, তেমনি আমাদের সুদিনও একসময় শেষ হলো। দেবপালের পর কয়েকজন অযোগ্য রাজা এসে সব শেষ করে দিলেন। একে একে রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগলো। যে পারলো সে-ই এসে বাঙলা আক্রমণ করলো।

– রাজারা তাহলে কী করছিল বসে বসে?

– দুর্বল আর অক্ষম রাজা হলে এমনই হয়। বাবা বললো। এরপর মহীপাল বলে এক পরাক্রান্ত রাজা এসে শেষ চেষ্টা করেছিলেন বাঙলাকে রক্ষার। রক্ষা করেছিলেনও অনেকটা।

https://nagorikpathagar.org

একের পর এক হৃত রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন, রাজ্যসীমাও বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু এত কিছু করলে কী হবে, সমাজ আর রাষ্ট্র ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাই মহীপালের মৃত্যুর পরে হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়লো। বাঙলা দখল করলো সেন বংশ। তবে তার আগে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৈবর্ত বলে এক জেলে-সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে স্বাধীন করেছিল, বেশ কিছুদিন রাজত্বও করেছিল। তাদের সম্পর্কে তোমাকে পরে বলবো। তাদের তৈরী করা বিখ্যাত বাঁধও আমরা দেখবো।

– আচ্ছা, পাল রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল? আমি জানতে চাই বাবার কাছে।

– পাল রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল রামাবতী। রামাবতী রাজধানীটি তৈরী করেছিলেন পাল রাজা রামপাল। এটা ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে, সম্ভবত নওগাঁয়। নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার একটি গ্রামে পাওয়া গেছে আরেকটি বিহার; তার নাম জগদ্দল বিহার। রামাবতীর আগে পালদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

– পাটলিপুত্রটা কোথায়?

– এটা এখন ভারতের 'পাটনা'।

রামচরিত নামে সেই সময়ের কাব্যে পাল রাজধানী রামাবতীর মনোরম বর্ণনা আছে। কবি লিখেছেন, "প্রশস্ত রাজপথের ধারে কনক পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী মেরু শিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং ইহার উপর স্বর্ণ কলস শোভা পাইত; নানা স্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী ও নানাবিধ পুষ্প, লতা, তরু, গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি করিত। হীরক, বৈদূর্যমণি, মুক্তা, মরকত, মাণিক্য ও নীল মণি খচিত

https://nagorikpathagar.org

আভরণ, বহুবিধ স্বর্ণ খচিত তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, কালাগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, ও কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, এবং নানা যন্ত্রোত্থিত মন্দ্রমধুর ধ্বনির সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত সেকালের নাগরিকদের ঐশ্বর্য, সম্পদ, রুচি ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিত।"

https://nagorikpathagar.org

ভীমের জাঙ্গাল

ফিরে আসতে আসতে বাবা একটা উঁচু বাঁধের মতো জায়গা দেখিয়ে বললেন, এটাই হচ্ছে সেই কৈবর্ত রাজা ভীমের তৈরী বাঁধের অংশ। বগুড়া থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে নানা জায়গায় এই বাঁধের অংশ দেখা যায়। এগুলোকে বলা হয় ভীমের জাঙ্গাল। জাঙ্গাল মানে বাঁধ। এই জাঙ্গাল থেকে বাঙ্গাল শব্দ এসেছে বলে ধারণা করা হয়। কৈবর্ত রাজ ছিল বাঙালীর প্রথম শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবে সৃষ্ট এবং শ্রমজীবীর রাষ্ট্র, যা টিকে ছিল ১০৭৫ সাল থেকে ১০৮২ সাল পর্যন্ত।

– কৈবর্ত মানে কী? আমি জানতে চাই।

– জেলে-সম্প্রদায়কে কৈবর্ত বলা হয়।

– জেলে রাজা? আমি অবাক হয়ে বলি।

– আসলে জেলে নয় সবাই, তবে অনেকেই জেলে ছিলেন। মূলত এটা ছিল সাধারণ মানুষের রাজ্য। তবে এটা ঠিক, কৈবর্তরা ছিল মূলত জেলে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা মাছ ধরে

https://nagorikpathagar.org

উত্তর ভারতে শশাঙ্কের যুদ্ধ

www.pathagar.org

জীবিকা নির্বাহ করতো এবং নৌকা চালাতে পারদর্শী ছিল। তারা নৌযুদ্ধে রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং কৈবর্তনেতা দিব্যর নেতৃত্বে বরেন্দ্রীকে পৃথক রাজ্যে রূপান্তর করেন।

– বরেন্দ্রী কোথায়?

– বরেন্দ্রভূমি হচ্ছে একটা ভূ-প্রাকৃতিক এলাকা। এই এলাকার পূর্বে আছে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা নদী এবং দক্ষিণে গঙ্গা নদীর উত্তর পাড়। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা-জুড়ে বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবনভূমি থেকে এই বরেন্দ্রভূমি কিছুটা উঁচুতে।

– প্লাবনভূমি আবার কী?

– যেই ভূমিতে বন্যার পানি আসে সেটাই প্লাবনভূমি।

– তাহলে বরেন্দ্র অঞ্চলে বন্যা হয় না?

– কম হয়, অল্প কিছু অঞ্চলে হয় যেই অঞ্চলগুলো নদীর খুব কাছে। আমরা আবার আগের গল্পে ফিরে আসি।

দিব্যর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তাঁর ছোট ভাই রুদোক ও তারপরে রুদোক পুত্র ভীম। ভীম নিজেকে একজন দক্ষ ও জনপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বরেন্দ্রীকে খুব অল্প সময়েই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর-সান্তাহার মহাসড়কের উত্তরে গ্রামের প্রায় ১০০ একর উঁচু ভূমির মধ্যে ২০ একরজুড়ে একটি বিশাল দীঘিতে কৈবর্ত স্তম্ভ আজও এই

https://nagorikpathagar.org

রাজবংশের স্মৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভটি পানির নীচে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে পানির উপরে মাথা তুলে থাকা ৯.১৪ মিটারের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়।

– কেন এটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়?

– পানির নীচ থেকে ভিত তুলে আজকে যেমন ব্রিজ তৈরী করা হয় সেই কৌশল এই অঞ্চলে তখনও জানা ছিল না।

কৈবর্তদের পানির সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং তাঁদের জলজ ঐতিহ্য থেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় উত্থানের গৌরবকে প্রতীকায়িত করছে এই স্তম্ভ। এই অঞ্চলে ভীমের আরেকটা নিদর্শন আছে, ভীমের পন্টি নামে। ভীমের পন্টি নওগাঁ জেলার ধামইরহাটের ভিতর পড়েছে, জাহানপুর ইউনিয়নের মুকুন্দপুর-হরগৌরী নামে জায়গাটি। পন্টিটি অবশ্য এই স্তম্ভের মতোই, তবে শুকনো মাটিতে দাঁড়ানো। তবে এই পন্টিটা কিন্তু কৈবর্তরাজ ভীমের নয়। যদিও স্থানীয়রা এটা ভীমের মনে করে। এই পন্টিকে মূলত স্থানীয়রা মনে করে মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের লাঠি। আঞ্চলিক ভাষায় লাঠির নাম পন্টি। প্রচলিত আছে ভীম এই লাঠি দিয়ে মাটি সমান করতে করতে এসে এখানে লাঠি পুঁতে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

– তাই নাকি এটা সত্যি?

– আরে না। এটার সাথে রাজা ভীম বা পাণ্ডব ভীমের দূরতম সম্পর্ক নাই।

– এটা তাহলে কার করা?

– এটা পাল রাজাদের সপ্তম রাজা নারায়ণ পালের সময়ে তৈরী।

https://nagorikpathagar.org

– কেন করেছিল এই পন্টিটা?

– এই কষ্টিপাথরের কালো স্তম্ভে পালি ভাষায় রাজার বংশ পরিচয় লেখা আছে।

– আর এই জাঙ্গাল কী কাজে লাগতো? আমি জিজ্ঞেস করি।

– এই অঞ্চলে বাঁধের কাজ করতো জাঙ্গাল, এছাড়া সেচ চলতো। চলো, তোমাকে কাছে থেকে জাঙ্গাল দেখাই। আর আরেকটা মজার জিনিষ দেখাবো তোমাকে। বাবা বলে।

আমরা শিবগঞ্জ উপজেলার দিকে যাই গাড়ী নিয়ে। এর মধ্যে একটা ছোট ব্রিজের উপরে বাবা গাড়ী থামাতে বললো।

– এই যে নদীটা দেখছো, এর নাম নাগর। অবশ্য এটা নদী নয়, নদ। নদ মানে কী জানো তো? বাবা জিজ্ঞেস করে।

– হ্যাঁ জানি, নদ মানে যেটার নাম পুরুষবাচক।

– ঠিক। এই নাগর নদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতা লিখেছিলেন। "আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।"

আমি হো হো করে হেসে উঠি, রবীন্দ্রনাথও তাহলে ভুল করে নদকে নদী লিখেছে?

– উনি তো আর বলেননি আমাদের নাগর নদী। যদি বলতেন তাহলে ভুলের কথা আসতো। এই নাগর রবীন্দ্রনাথের নওগাঁর পতিসরের কুঠিবাড়ীর সামনে দিয়ে গেছে।

আমি এই ছোট খালের মতো নাগর নদ দেখে খুব কষ্ট পেলাম।

https://nagorikpathagar.org

চিক চিক বালিও নেই, ঢালু পাড়ও নেই। একটা বড় নর্দমার মতো নাগর নদ এখন।

আমরা ব্রিজ পেরিয়ে সামনে এগোলাম। বাবা বলে চলেছে।

– এখানে দুটো জিনিষ দেখা যাবে– একটা হচ্ছে আরো কাছে থেকে ভীমের জাঙ্গাল, আরেকটা ভাসু বিহার। ভাসু বিহার ছিল পাল রাজাদের তৈরী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাস্তায় মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে করে এগোতে থাকল আমাদের গাড়ী। প্রথমেই পড়লো ভীমের জাঙ্গাল। উঁচু পাথরের ঢিপির মতো জায়গা। সামনে কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই ঢিপি থেকে অনেক মানুষ মাটি কেটে কেটে ট্রাকে ভরছে। বাবা জিজ্ঞেস করলো ওদের, এটা কাটছেন কেন? তাঁরা বললো, এটা ইটের ভিটায় যাবে, ইট তৈরী হবে। বাবা বললো, সর্বনাশ। এই অমূল্য কীর্তি এরা শেষ করে দেবে। এর মধ্যেই বাবা তার কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুকে ঘটনাটা ফোনে জানালো, যেন এই জাঙ্গালটা কাটা বন্ধ করা যায়।

আমরা মন খারাপ করে চলে এলাম।

– জাঙ্গালটা কেটে না ফেললে কী হতো?

– এটা তো আমাদের ইতিহাস। আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারতাম আমরা সেই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কত উন্নত ছিলাম। হাজার বছর পরেও এই মাটির বাঁধ কীভাবে টিকে থাকলো সেটা দেখাতে পারতাম। নদী-বিশেষজ্ঞরা এই বাঁধ নিয়ে গবেষণা করতে পারতেন। সেইসব কিছুই থাকবে না। একদম শেষ হয়ে যাবে অমূল্য ইতিহাস। বাবা বলে।

https://nagorikpathagar.org

আদি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান পাঠ

এবার আমরা যাবো ভাসু বিহার। বাবা বললেন, মহাস্থান গড় থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে ভাসু বিহারের অবস্থান। তিন দিকে ফসলী মাঠ আর একপাশে গ্রামে ঘেরা ভাসু বিহার স্থানীয়দের কাছে নরপতির ধাপ নামে পরিচিত। উঁচু টিলা আকৃতির এই ধাপটি একসময় ছিল বৌদ্ধ বিহার। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৯-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এই বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন, এই বৌদ্ধ বিহারে তিনি ৭০০ ভিক্ষুকে পড়ালেখা করতে দেখেছেন।

– ৭০০ জন মানে তো খুব বেশী নয়।

– হ্যাঁ, এখনকার হিসেবে খুব বেশী নয়। কিন্তু তখন তো মানুষই ছিল কম। তাই ৭০০ বেশ বড় সংখ্যা তখনকার হিসেবে। বাবা বলে। দুই হাজার বছর আগে গড়ে ওঠা ওই জনপদ এখন টিকে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে। বিহারের অপূর্ব নির্মাণশৈলী যে-কাউকে তাক লাগিয়ে দেবে। পোড়া মাটি (ইট) আর সুরকির কি এমন শক্তি ছিল যে দুই থেকে

https://nagorikpathagar.org

রাজা ভীমের যুদ্ধ

https://nagorikpathagar.org

আড়াই হাজার বছর পরেও চিহ্ন রেখে গেছে! তাদের কি এমন নির্মাণকৌশল ছিল? এমন প্রশ্ন মনের মধ্যে গেঁথে যাবে সবার। বিহারের ধাপে ধাপে বেশকিছু কক্ষ রয়েছে।

– এই কক্ষে কারা থাকতো? আমি জানতে চাই।

– ধারণা করা হয়, বিহারের উত্তর-পশ্চিম কোণের কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পড়ালেখা করতো আর আবাসিক কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতো। বিহারের ঠিক দক্ষিণ অংশে ভিক্ষুদের উপাসনালয়ের জন্য একটি মন্দির বা এজাতীয় কিছু নির্মাণ করা হয়েছিল। কালের বিবর্তনে ভাসু বিহার এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ।

– এখানে ছাত্ররা কী পড়তো? আমি জানতে চাই।

– প্রথমে পড়ানো হতো বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্ম মানে শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়। নীতিশাস্ত্র, আইন এসবও পড়ানো হতো। আর একটা খুব মজার বিষয় পড়ানো হতো। তার নাম অভিধম্ম। অভিধম্ম ছিল পৃথিবীর প্রথম মনোবিজ্ঞান। এই মনোবিজ্ঞান চিন্তার সূচনাও এখানে।

আমরা এবার ফিরতে থাকি বগুড়াতে। ফেরার পথে বাবা বলতে থাকে, রাজা ভীম সমগ্র বাঙলা জয় করতে পারেননি। বরেন্দ্রীর বাইরে ছিল পালদের শাসন। পালরা ধীরে ধীরে কিছু কিছু করে এলাকা কৈবর্তদের কাছে হারাচ্ছিল। মহীপালের মৃত্যুর পরে রামপাল সিংহাসন লাভের পর ভীমের জনপ্রিয়তা, দক্ষতা, উদারতা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হন। আরও ভূমি হারানোর ভয়ে তিনি প্রতিবেশী ও সামন্ত রাজাদেরকে অপরিমিত অর্থ ও ভূমি দান করেন। ফলে যুদ্ধে তারা রামপালকে সহযোগিতা করতে রাজী হয়। এই যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্যের সাথে ভীমের নবগঠিত রাষ্ট্রের পেরে ওঠা অনেকটা অসম্ভব ছিল। গঙ্গার

https://nagorikpathagar.org

উত্তর তীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবিত অবস্থায় ভীম বন্দিত্ববরণ করেন। ভীমের রাজকোষ পাল সেনারা লুণ্ঠন করে।

বন্দী হওয়ার পর ভীমের অন্যতম সুহৃদ, বিশ্বস্ত হরি পরাজিত সৈনিকদের একত্রিত করেন এবং রামপালের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার করেন। হরির নেতৃত্বে যখন সেনারা যুদ্ধজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন রামপাল তাঁর রাজকোষ উজাড় করে দিয়ে হরির সৈন্যদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। হরির যুদ্ধযাত্রা আর করা হয় না। এর মাধ্যমেই বরেন্দ্রীর স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্ন চিরতরের জন্য মৃত্যুবরণ করে এবং তা পুনরায় পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কৈবর্তরা যেন আর কখনো রুখে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য পালরা কৈবর্ত নেতাদের কঠোর শাস্তি দেয়। ভীমের পরিবারকে তাঁর সামনে হত্যা করা হয় এবং ভীমকেও পরবর্তী পর্যায়ে হত্যা করা হয়। পাল রাজত্বের অনেক গৌরবের পাশে ভীমের হত্যা একটি বড় কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

– তুমি তো আমাকে শুধু উত্তরবঙ্গই দেখালে। আর বাকী অংশে কোনো রাজা ছিল না?

– ভালো প্রশ্ন করেছ। প্রাচীন যুগে বেশ কিছুকাল ধরে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলা স্বাধীন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল বলে মনে হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর থেকে শুরু করে সেনবংশের উত্থান পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলা অঞ্চল মূল বাঙলার রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে ছিল।

খ্রিষ্টীয় ছয় শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ রাজ্যের তিনজন রাজা যথাক্রমে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায়।

https://nagorikpathagar.org

দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলা শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না তা নির্ণয় করা যায় না। এ অঞ্চলে 'ভদ্র' উপাধিধারী একটি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

খ্রিষ্টীয় সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরবর্তী গুপ্তগণ যখন গৌড়ের শাসনক্ষমতা দখল করেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় খড়্গ বংশের অভ্যুদয় ঘটে। খড়্গ বংশের রাজারা তিন পুরুষ ধরে সমতট শাসন করেছেন।

– সমতট যেন কোনটা?

– ভুলে গেছ? বাবা হেসে বলে। কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলকে সমতট বলা হতো। তাঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত-বাসক, কুমিল্লার কাছে বড় কামতা বলে যে জায়গাটা আছে সেটাই কর্মান্ত-বাসক ।

– তাহলে এই বড় কামতার রাজারাই ময়নামতিতে বৌদ্ধ বিহার করেছিল?

– না, তাঁরা নয়। খ্রিষ্টীয় আট শতকে দেব রাজবংশের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলা একটি বড় ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁদের রাজধানী ছিল ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলের দেবপর্বত। চারপুরুষ ধরে দেববংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করে।

– তাঁদের নাম কী ছিল?

– শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব; তাঁরা ছিলেন প্রথম দিকের পাল রাজাদের সমসাময়িক। দেববংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতি অঞ্চল বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ময়নামতিতে কয়েকটি

https://nagorikpathagar.org

বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। তুমি তো জানো এগুলোর মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও ভোজ বিহার উল্লেখযোগ্য। দেববংশের রাজাগণ এগুলো তাঁদের রাজধানী দেবপর্বতের কাছেই নির্মাণ করেছিলেন।

– দেবপর্বতটা কোথায় ছিল?

– এই শহরটির সঠিক অবস্থান এখনো নির্ণয় করা যায়নি। দেখো তুমি বড় হয়ে করতে পারো নাকি। বাবা হেসে বলে।

– হুঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল, কারণ ময়নামতি আর পাহাড়পুর দেখতে আলাদা। যদিও দুইটাই বৌদ্ধ বিহার ছিল। আমি খুব বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বাবাকে বলি।

– হ্যাঁ, ঠিক তাই, ক্রুশাকৃতির কেন্দ্রীয় মন্দির নির্মাণের শৈল্পিক রীতি পূর্ণতা পায় পাহাড়পুর বিহারে। ক্রুশাকৃতির নির্মাণ কৌশল শুরু হয়েছিল ময়নামতি অঞ্চলে। এখানে এ রীতির আদি ও অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ দেখতে পাবে।

– পাহাড়পুর তাহলে ময়নামতির পরের বিহার?

– ঠিক তাই।

– আর হরিকেলের রাজারা?

– খ্রিষ্টীয় নয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় হরিকেল রাজ্যের উদ্ভব হয়। চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হরিকেল রাজাদের পর চন্দ্র রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে। এ বংশের শাসকেরা পাঁচ পুরুষ ধরে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রায় ১৫০ বছর হরিকেল শাসন করেন। সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলা এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটসহ বঙ্গ ও সমতটের বিস্তীর্ণ

https://nagorikpathagar.org

অঞ্চল তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঢাকার দক্ষিণে বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর ছিল তাঁদের রাজধানী। চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাঁরা ছিলেন পাল রাজাদের সমসাময়িক।

– চন্দ্রবংশীয় রাজাদের নাম কী ছিল?

– ত্রৈলোক্যনাথ, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র।

– লড়হচন্দ্র কি লড়াই করতো শুধু?

বাবা এই কৌতুক শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলতে থাকে।

–শ্রীচন্দ্র ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময়ে চন্দ্র সাম্রাজ্য সীমান্তের ওপারে কামরূপ বা আসাম পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। গৌড়ের সাথে চন্দ্র রাজাদের যুদ্ধও হয়েছিল।

এদিকে এগারো শতকের শেষ দিকে পাল সাম্রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মণ রাজবংশীয়রা এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। বর্মণ রাজবংশের পাঁচজন রাজা জাতবর্মণ, হরিবর্মণ, শ্যামলবর্মণ, ভোজবর্মণ একশো বছরের কিছু কম সময় রাজত্ব করেন। বর্মণরা সেনদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বর্মণরা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং তাঁদেরও রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার শাসকেরা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ উপকূল দিয়ে পরিচালিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে দারুণ সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা এর সত্যতা প্রমাণ করে। নয় থেকে এগারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আরব বণিক ও নাবিকদের বিবরণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ

https://nagorikpathagar.org

করে সমন্দর বন্দর দিয়ে সমুদ্রপথে ব্যাপক বহির্বাণিজ্যের কথা জানা যায়।

– সমন্দর বন্দরটা কোথায় ছিল?

– আরবদের বর্ণিত এ সমন্দর বন্দরটিকে বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি কোনো স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার শাসকেরা এ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ফলে রৌপ্য মুদ্রা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় রুপার পাত সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এ আমলের তথ্যাদি থেকে নৌযান নির্মাণের কারখানার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এ থেকে ক্রমপ্রসারমাণ সামুদ্রিক বাণিজ্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যায়।

https://nagorikpathagar.org

পাল রাজার শেষ
সেন রাজের শুরু

রামপাল কতদিন রাজত্ব করেছিলো? আমি বলি।

– বেশীদিন নয়। রামপাল শেষ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে পারেননি। পালদের হটিয়ে দিয়ে আসে সেনরা। এরপর থেকে বাঙলায় বাঙালীর রাজত্বের অবসান ঘটে। বাঙলার পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেন রাজবংশের শাসনকালের সূচনা হয়। একাদশ শতকে সেন রাজারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে এই রাজ্যটিই বিশাল আকার ধারণ করে। সেনরা কিন্তু বাঙালী ছিল না।

– কিন্তু সেন শুনলে তো বাঙালী মনে হয়।

– সেনরা ছিল কর্ণাটকের অধিবাসী।

– ওরা এখানে আসলো কীভাবে?

– পাল রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে অনেক রাজ্যের লোক ছিল।

https://nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনীতে চাকুরীর সূত্রে সেনরা বাঙলায় আসে এবং এখানেই থেকে যায়। সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল কর্ণাটকের মহীশূর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। তারা ঠিক কোন সময়ে বাঙলায় এসেছিলেন তা জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, সামন্ত সেনই প্রথম বাঙলায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে সেন রাজবংশের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাঙলায় যে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, সেন রাজারা তা রোধ করেন। এই সময় বাঙলায় হিন্দুধর্ম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মুসলমান রাজত্বকালেও যে বাঙলায় হিন্দু-সংস্কৃতি টিকে ছিল, তার অন্যতম কারণ এই সংস্কৃতিতে সেন রাজাদের অবদান। সেন রাজবংশে লক্ষ্মণ সেনের বাবা বল্লাল সেন ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। দিনাজপুরে এখনো একটা দীঘি আছে, যা বল্লাল সেন খনন করিয়েছিলেন। সেটার নাম বল্লাল দীঘি। আরো অনেক জায়গায় বল্লাল দীঘি নামে দীঘি আছে। বল্লাল সেনের আমলেই হিন্দুদের কুলীন প্রথা চালু হয়, যা এখনো অনেকটা টিকে আছে।

– তার মানে কুলীন ব্রাহ্মণ কথাটা শুনি সেটা সেন বংশের দেওয়া?

– হ্যাঁ তাই, কুলীন প্রথা যে শুধু ব্রাহ্মণদেরই ছিল তা নয়, কুলীন কায়স্থও ছিল।

– কুলীন প্রথাটা আসলে কী?

– কৌলীন্য প্রথা বা কুলীন প্রথা হচ্ছে সেই প্রথা যাতে কোনো জাতি বা গোষ্ঠী বা বর্ণ বা সম্ভ্রান্ত বংশ যারা সামাজিক সম্মান

https://nagorikpathagar.org

ভোগ করে এবং ঐতিহ্যগতভাবে নিজেদের সামাজিক অবস্থান এবং 'কুল' পরিচিতি ধরে রাখে।

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব মতবাদের কঠোর অনুসারী। তিনি 'পরমবৈষ্ণব' বা 'পরম নরসিংহ' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর ধর্মমত পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। লক্ষ্মণ সেন তাঁর অসামান্য গুণাবলী ও দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। *তবকাত-ই-নাসিরির* লেখক মিনহাজ-উস-সিরাজ তাঁর দানশীলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাঙলার 'মহান রায়' হিসেবে অভিহিত করেন এবং দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের তুল্য বিবেচনা করেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজত্বকে কামরূপ (বর্তমানে আসাম), কলিঙ্গ (বর্তমানে উড়িষ্যা), এবং কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তবে তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে অবশ্য লক্ষ্মণ সেন রাজকার্য পরিচালনায় দুর্বল হয়ে পড়েন। এই সময় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও সংহতির অভাব দেখা দেয় এবং সেন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কতকগুলো বিদ্রোহী প্রধান মাথাচাড়া দেয়। সমাজে অনাচার-আলস্য জেঁকে বসে। আলস্য আর যথেচ্ছ ভোগবাদ ভিতর থেকে সমাজকে দুর্বল করে ফেলে। সমাজ হয়ে ওঠে ভাগ্যনির্ভর। এই সময়ে নাকি জ্যোতিষীদের রমরমা ব্যবসা ছিল। জ্যোতিষীদের গণনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। এ সময়ে বখতিয়ার খলজী নদীয়ায় লক্ষ্মণ সেনের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। জ্যোতিষীরা বলেছিল, খর্বকায় এক মুসলিম যোদ্ধার হাতে সেন বংশের পতন হবে। জ্যোতিষীদের গণনায় আস্থা রেখেছিলেন বলেই রাজা-সৈন্য-মন্ত্রী বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সবাই পালিয়ে যান। সমাজের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে গেলে সেই সমাজের মানুষ ভাগ্যনির্ভর হয়ে ওঠে।

– জ্যোতিষীরা তাহলে ঠিক কথা বলে কোনো কোনো সময়?

https://nagorikpathagar.org

বাবা হেসে ওঠে। বলে, বখতিয়ার খলজী বেশ কিছুদিন ধরেই নানা জায়গায় আক্রমণ করে লুটতরাজ করছিল। তাই তার দেহের বর্ণনা পাওয়া জ্যোতিষীদের জন্য কঠিন ছিল না। তুমি দেখবে জ্যোতিষীরা বেশ চালাক-চতুর। তাই নানা ঘটনা জুড়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করলে অনেক সময়ই সেটা ফলে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে জ্যোতিষবিদ্যা একটি বিজ্ঞান।

আমি ভাবতে থাকি জ্যোতিষীদের কাণ্ড-কারবার নিয়ে। বাবাকে বলি, জ্যোতিষীরা তো স্বাস্থ্য নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করে?

– হ্যাঁ, করে। কিন্তু সেগুলোও তাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও কাণ্ডজ্ঞান থেকে করে।

– আচ্ছা, তুমি আর মা দুইজনই তো ডাক্তার। বাঙালীরা আগে ডাক্তারি করতো না?

– হ্যাঁ, করতো, নিশ্চয় করতো। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ 'রুগ বিনিশ্চয়' এবং 'নিদান' গ্রন্থের লেখক মাধব বাঙালী ছিলেন বলে দাবী করা হয়। চরক ও সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার চক্রপাণি দত্ত ছিলেন বাঙালী। তাঁর সময়কাল ছিল একাদশ শতকের মধ্যভাগ। তিনি একটি বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'চিকিৎসা সংগ্রহ' রচনা করেন। তিনি সেই বইয়ের ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি গৌড়ের বাসিন্দা এবং তাঁর পিতা ছিলেন রসবত্যধিকারী অর্থাৎ গৌড় অধিপতির রন্ধনশালার অধ্যক্ষ। চক্রপাণি দত্তের ভাই ভানুও ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক। চক্রপাণি দত্তের আরও তিনটি চিকিৎসাগ্রন্থের নাম 'আয়ুর্বেদ দীপিকা', 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ'। চক্রপাণি তাঁর বইয়ে ধনী মানুষদের স্বাস্থ্যকর খাবারের একটা নির্দেশ দিয়েছিল।

শুনবে সেটা?

https://nagorikpathagar.org

– আবারও খাবার? আমি খাবারের কথা শুনতে চাই না।

– আরে শুনেই দেখো না কেমন ছিল সেই খাবার, তোমার পছন্দের খাবারই ছিল সেখানে।

– আচ্ছা শুনি। পছন্দের খাবার শুনে একটু আগ্রহ যে হয় না সেটা বলব না।

– প্রথমে দুগ্ধ পান করতে হবে। তারপরে ভালো করে সিদ্ধ শালি চালের ভাত। তাতে প্রচুর ঘি দিতে হবে, আর পক্ষী-মাংসের সহযোগে খেতে হবে। মাংস যদি না পাওয়া যায় তবে নির্দোষ বড় মাছ খাওয়া চলবে।

– নির্দোষ মাছ আবার কী জিনিষ?

– রুই, মাগুর, শোল। এসব মাছ পুড়িয়ে (অর্থাৎ রোস্ট করে) খেলে প্রায় মাংসের সমান উপকার পাওয়া যাবে। এটাই চক্রপাণির উপদেশ।

এ ছাড়া দ্বাদশ শতকে সুরেশ্বর অথবা সুরপাল নামে আরেকজন চিকিৎসাগ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি পারিবারিকভাবে রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁর পিতামহ দেবগন রাজা গোবিন্দচন্দ্রের এবং পিতা ভদ্রেশ্বর রামপালের রাজবৈদ্য ছিলেন। সুরেশ্বর 'শব্দ প্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া ওষুধে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে 'লৌহ-পদ্ধতি' বা 'লহা সর্বস্ব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

'চিকিৎসা সার সংগ্রহ' নামে আরেক বিখ্যাত প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থের গ্রন্থকার বঙ্গ সেন বাঙালী ছিলেন বলে মনে করা হয়।

https://nagorikpathagar.org

প্রাচীন বাঙলার চিকিৎসা নিয়ে আরেকজনের লেখা আছে, তাঁর নাম জন বাড ফিয়ার। জেমস বাড ফিয়ার ছিলেন ব্রিটিশ কলোনিয়াল সার্ভিসের অফিসার। পূর্ববঙ্গের শাসনকাজে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, এরপরে কিছুদিন শ্রীলঙ্কাতেও ছিলেন। তিনি একটা বই লেখেন "দ্য এরিয়ান ভিলেজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন" নামে। সেখানে একটা চ্যাপ্টার ছিল "মডার্ন ভিলেজ লাইফ ইন বেঙ্গল"।

এই বইয়ে ফিয়ার সাহেব সেই সময়ের বাঙলার চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছেন। সেখানে তিনি বাঙলাকে খুব কুৎসিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন উনার কাছে বাঙলার গ্রামের ঘরগুলোতে যে আলপনা করা হতো সেগুলো নাকি খুব কুৎসিত লেগেছে। ফিয়ারের বই থেকে একটা অংশ পড়ে শোনাই তাহলেই বুঝবে বইটি জুড়ে কেমন জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন তিনি :

"আধুনিক বাঙালীর পরিচ্ছন্নতাবোধ কোনো অবস্থাতেই খুব উন্নত নয়। দেখিয়ে না দিলে সে সরলরেখা কিংবা সমান বক্ররেখা আঁকতে একেবারেই অক্ষম। তার ক্ষেতের হালের রেখা, কিংবা সীমারেখা, কিংবা চারাগাছের সারি, সবই দেখলে মনে হয় যেন মাকড়সার পায়ে কালি লাগিয়ে কাগজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

এহেন ফিয়ার সাহেব বাঙলার চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে কী লিখেছেন দেখো :

"অনেক গ্রামেই কবিরাজ বা দেশীয় ডাক্তার চাদরের খুঁটে বাঁধা কাগজের মোড়কে ওষুধের বড়ি নিয়ে চলেছেন। বহু যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রস্তুত এই ওষুধগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কার্যকর। ইংরেজ ডাক্তারেরা আরও কার্যকরভাবে

https://nagorikpathagar.org

দেশীয় চিকিৎসাপ্রণালীর সাহায্য নিতে পারেন। চিকিৎসার আগেই কবিরাজ খানিকটা দর কষাকষি করে তাঁর পারিশ্রমিক ঠিক করে নেন। সাধারণ ওষুধের ক্ষেত্রে এক কিংবা দুই টাকা। ম্যালেরিয়া জ্বর হলে তাঁকে দু-তিন বার রুগী দেখতে যেতে হয়।"

আমরা বাঙলার সেই চিরায়ত চিকিৎসা-ব্যবস্থা হারিয়ে ফেলেছি, সেটা কোনো অবস্থাতেই পশ্চিমের চেয়ে হীন ছিল না। সভ্যতাগর্বে দর্পী ফিয়ার সাহেবও সেই সাক্ষ্যই দিতে বাধ্য হয়েছেন।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলায় মুসলিম শাসনের শুরু

বখতিয়ার খলজী কে ছিলেন, কোথা থেকে এলেন? আমি খাবার-দাবার আর চিকিৎসা ছেড়ে গল্পে আসতে চাই।

বাবা হাসতে হাসতে বলে, তুমি মনে রেখেছো দেখছি নামটা। বখতিয়ার খলজীর জন্ম আফগানিস্তানে। মনে করা হয় তিনি জাতিতে *Turkish* ছিলেন। তিনি ছিলেন *Turkic*। প্রথমটা দ্বারা তুরস্কের মানুষ এবং দ্বিতীয়টা দ্বারা বৃহত্তর তুর্কি জাতি বোঝায়। দ্বিতীয় দল মূলত মধ্য এশিয়ার মানুষ, পরে আজকের তুরস্কসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি ছিলেন ভাগ্যসন্ধানী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দারুণ যোদ্ধা। তিনি আসলে এই বাঙলায় লুট করতে এসেছিলেন। তাই মুসলিম শাসনের প্রথম দিনগুলো খুব একটা গৌরবের ছিল না। বখতিয়ারের হাতদুটো অস্বাভাবিক লম্বা ছিল। লম্বা হাত তুরস্কে অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করা হতো। তাই তিনি কোথাও চাকরি না পেয়ে শেষে ভারতে এসে মাত্র দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে বাঙলার ছোট ছোট রাজ্যগুলো আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে থাকেন।

https://nagorikpathagar.org

– যে বাঙলার রাজা হবে সে লুট করবে কেন?

– তিনি নিজেও হয়তো ভাবেননি যে একদিন তিনি বাঙলার সিংহাসনে বসবেন। তিনি ভেবেছিলেন কিছু লুটপাট করে সম্পদ সংগ্রহ করবেন। সেই সময়ে তাঁর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলিম সৈনিক তাঁর বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে। ফলে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে তিনি একদিন এক প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মতো স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোনো বাধাই দেয়নি। দুর্গজয়ের পর তিনি দেখলেন যে দুর্গের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই মুণ্ডিতমস্তক এবং দুর্গটি বইপত্র দিয়ে ভরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানতে পারলেন যে তিনি একটি বৌদ্ধবিহার জয় করেছেন। সেই সময় থেকেই মুসলমানেরা জায়গাটিকে বিহার বা বিহার শরীফ নামে ডাকে। ভারতের বিহার অঞ্চলের নামকরণ বখতিয়ারের কারণেই হয়েছে।

– বিহার তো আর রাজপ্রাসাদ ছিল না যে সেটা ধ্বংস করতে হবে? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– বখতিয়ার আসলে ভুল করে বিহারকে একটা দুর্গ ভেবে আক্রমণ করে। এমন তথ্য পাওয়া যায় কোনো কোনো গ্রন্থে। তোমাকে পড়ে শোনাই :

"মহম্মদ বখতিয়ার নামক খিলজী বংশীয় একজন তুরস্ক সেনানায়ক উপযুক্ত কর্মানুসন্ধানে মহম্মদ ঘোরী ও কুতুবুদ্দিনের নিকট গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে অযোধ্যায় মালিক হুসামুদ্দিনের অনুগ্রহে চুনারগড়ের নিকট দুইটি পরগণা জায়গীরপ্রাপ্ত হন। এখান হইতে বখতিয়ার দুই বৎসর যাবৎ

https://nagorikpathagar.org

মগধের নানাস্থান লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অবশেষে দুইশো অশ্বারোহী সৈন্যসহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া 'কিল্লা বিহার' অধিকার করেন। ইহার মুণ্ডিত মস্তক অধিবাসীদিগকে নিহত ও বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠন করার পরে আক্রমণকারীগণ জানিতে পারিলেন যে ইহা বস্তুত 'কিল্লা' বা দুর্গ নহে, একটি বিদ্যালয় মাত্র, এবং হিন্দুর ভাষায় ইহাকে 'বিহার' বলে।"

– এটা কোন বই থেকে পড়লে?

– এই বইয়ের নাম 'বাংলা দেশের ইতিহাস', শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন। অনেক পুরনো বই। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও ছিলেন।

প্রচলিত আছে বখতিয়ারের ধ্বংসকৃত বিহারই নালন্দা বিহার। সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

– ওটা কি তাহলে নালন্দাই ছিল যেটা বখতিয়ার ধ্বংস করেছিল?

– না, এটা সম্ভবত মিথ। বখতিয়ার নালন্দায় কখনো যাননি। বখতিয়ারের মৃত্যুর পরেও নালন্দায় পড়তে এসেছেন ধরমসাভমিন নামের তিব্বতের এক ভিক্ষু, সেটা তাঁর বইয়ে লেখা আছে।

বিহার জয়ের পর বখতিয়ার খলজী বাঙলা জয়ের জন্য সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন।

সেই সময় বাঙলার রাজা লক্ষ্মণ সেন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। কারণ নদীয়া ছিল বহিঃশত্রু থেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত অঞ্চল। লক্ষ্মণ সেন যৌবনে বীর বলে পরিচিত হলেও

https://nagorikpathagar.org

বখতিয়ার খলজী যখন বাঙলা আক্রমণ করতে আসেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। সেই সময় গঙ্গাতীরে লক্ষ্মণ সেনের একটা আবাস ছিল, সেখানে তিনি আসতেন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য। নদীয়া রাজধানী ছিল না, তবে যেহেতু বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি থাকতেন তাই সেটাকে বাঙলার দ্বিতীয় রাজধানী বলা চলে। বলা হয়ে থাকে যে নদীয়ায় আসার কিছু আগে রাজসভার কিছু জ্যোতিষী তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এক তুর্কী সৈনিক তাঁকে পরাজিত করতে পারে। লক্ষ্মণ সেন ভয় পেয়ে নদীয়ার প্রবেশপথ রাজমহল ও তেলিয়াগড়ের নিরাপত্তা জোরদার করেন। লক্ষ্মণ সেনের ধারণা ছিল যে ঝাড়খণ্ডের শ্বাপদসংকুল অরণ্য দিয়ে কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে নদীয়া আক্রমণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু বখতিয়ার সেই পথেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আসেন। নদীয়া অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন সৈনিকই তাল মেলাতে পেরেছিল। বখতিয়ার ১৮ জন সেনা নিয়েই সোজা রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং দ্বাররক্ষী ও প্রহরীদের হত্যা করে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করেন। এতে প্রাসাদের ভিতরে হইচই পড়ে যায় এবং লক্ষ্মণ সেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে নৌপথে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন।

বখতিয়ার নদীয়া জয় করে পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষ্মণাবতীই পরবর্তী সময়ে লক্ষ্ণৌতি বা লক্ষ্ণৌ নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার আরও পূর্বদিকে বরেন্দ্র বা উত্তর-বাঙলা অধিকার করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এলাকাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একজন করে সেনাপতিকে শাসনভার অর্পণ করেন।

– তাহলে বখতিয়ার খলজী পুরো বাঙলা দখল করেনি? আমি

https://nagorikpathagar.org

অবাক হয়ে জানতে চাই।

– না, লক্ষ্মণ সেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিক্রমপুর থেকে মূলত পূর্ব-বাঙলা শাসন করেন।

– আর বখতিয়ার খলজী কোথায় শাসন করেন?

– বখতিয়ারের রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পূর্বে অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অখণ্ড বাঙলাদেশের বৃহদংশ তাঁর রাজ্যের বাইরে ছিল, ঐসব অঞ্চল দখল না করে তিনি তিব্বত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

তিব্বত আক্রমণের রাস্তা আবিষ্কারের জন্য বখতিয়ার বাঙলার উত্তর-পূর্বাংশের উপজাতিগোষ্ঠীর একজনকে দায়িত্ব দেন, তার নাম আলী মেচ। আলী মেচ ছিল একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম।

আলী মেচ রাস্তার খোঁজ দেওয়ার পরে সৈন্য সমাবেশ ও রসদ সংগ্রহসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর তিনি তিনজন সেনাপতি ও প্রায় দশ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লক্ষ্ণৌতি থেকে তিব্বতের দিকে অভিযান শুরু করেন। সৈন্যবাহিনী বর্ধনকোট শহরের কাছে পৌঁছায়।

– বর্ধনকোটটা আবার কোথায়?

– বাবা হেসে বলে, এই তো আসল জায়গা ধরে ফেলেছো। বর্ধনকোট বগুড়াতেই। বগুড়া-রংপুরের সীমানায়। 'কোট' শব্দের মানে জানো? বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করে।

– না, আমি কীভাবে জানবো।

https://nagorikpathagar.org

– সংস্কৃত 'কোট্ট' থেকে কোট শব্দের উৎপত্তি। কোট্ট অর্থ দুর্গ। কোট্টের অধিনায়ক ছিলেন কোট্টপাল। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের লেখনী, তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে 'কোট্টপাল' নামক দুর্গ-অধিনায়কের কথা জানা যায়। 'কোট্টপাল' শব্দটি স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রথমে 'কোটপাল', পরে 'কোটাল' শব্দে পরিণত হয়।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'কোট' শব্দযুক্ত অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায়; যেমন, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া, গাজীপুর জেলার সাহার বিদ্যাকোট, নওগাঁ জেলার মঙ্গলকোট, চট্টগ্রাম জেলার কোটেরপাড, বগুড়া জেলার বর্ধনকোট ইত্যাদি।

– বাব্বাহ, এতগুলো জায়গায় দুর্গ ছিল! আমি অবাক হই।

– বাবা হেসে বলে, এখনো শেষ হয়নি। কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট, কোটবাড়ী ও অন্ধিকোট; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিদ্যাকোট, পাঠানকোট ও ভলাকোট; নোয়াখালী জেলার বীরকোট; লক্ষ্মীপুর জেলার বদলকোট; কক্সবাজার জেলার রামকোট; সিলেট জেলার বারকোট; হবিগঞ্জ জেলার নৈতিকোট; বগুড়া জেলার বর্ধনকোট ও ফুলকোট; দিনাজপুর জেলার অসুরকোট, সীতাকোট, কোটপাড়া, বড়কোট ও উজালকোট; ঠাকুরগাঁও জেলার কোটালবাড়ী; নাটোর জেলার আচিলকোট; ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর; নরসিংদী জেলার নওলাকোট; ঢাকা জেলার কোটবাড়ী ও চিত্রকোট; মুন্সীগঞ্জ জেলার ধামালকোট ...।

বাবা, আরো বলার আগেই আমি থামিয়ে দিই বাবাকে।

– থাক থাক বুঝতে পেরেছি, আর শুনতে পারবো না।

বাবা হেসে উঠে মূল গল্পে ফিরে আসে। এরপর বখতিয়ারের

https://nagorikpathagar.org

বাহিনী তিস্তা নদীর চেয়েও তিনগুণ চওড়া বেগমতী নদী পার না হয়ে নদীর তীর ধরে তিন দিন চলার পর একটি পাথরের সেতুর কাছে আসে এবং সেখানে তারা দুইজন সেনাপতিকে সেতুর সুরক্ষায় রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হন। সামনে একটি কেল্লা পড়ে। ঐ কেল্লার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে বখতিয়ার জয়লাভ করলেও তার সৈন্যবাহিনী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেল্লার সৈন্যদের থেকে বখতিয়ার জানতে পারেন যে অদূরে করমবত্তন নামে এক শহরে কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এই কথা শুনে বখতিয়ার সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে পিছু হটেন। ফেরার পথে সেতুর কাছে এসে বখতিয়ার দেখেন যে, তাঁর দুই সেনাপতি শত্রুর আক্রমণে নিহত হয়েছে এবং সেতুটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। এরপর বখতিয়ার নানা দুর্যোগ পার হয়ে খুব অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ফিরে আসতে সক্ষম হন। তিব্বত অভিযান বিফল হওয়ার ফলে বখতিয়ারের শক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই বড়শী বোয়া নামক স্থানে তুর্কী সেনাদলের বিধ্বস্ত হওয়ার বিভিন্ন আলামত পাওয়া যায়। বাবা থামেন।

– গল্প শেষ?

–বখতিয়ারের গল্প আমাদের প্রায় শেষ। তিনি হতাশ হয়ে দেবকোটে ফিরে আসেন। তিব্বত অভিযান বিফল এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতির ফলে লক্ষ্মৌতির মুসলিম রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। পরাজয়ের গ্লানিতে বখতিয়ার অসুস্থ এবং পরে শয্যাশায়ী হন। এর অল্প কিছুদিন বাদে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় সেনাপতি আলী মর্দানের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। ধারণা করা হয়, মৃত্যুর আগে তিনি কালাজ্বর অথবা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার

তখন থেকেই কি মুসলমানেরা এদেশে? আমি বলি।

– খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। বাবা বলে। মুসলমানদের ভারতবর্ষে আসার আগের কিছু তথ্যপ্রমাণও পাওয়া গেছে। তবে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসনের সূচনা হয়। মুসলমানদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে।

– কীভাবে বাড়লো?

– তুমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো। বাবা বলে। এটা বোঝার জন্য আমাদের গল্প মাঝ থেকে একটু বাদ রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

– তা হোক, আমি সেটা আগে শুনতে চাই। পরে মাঝের অংশটা শুনবো।

ঠিক আছে বলে বাবা শুরু করলেন। অনেকেই মনে করেন, বাঙলায় হিন্দু-বৌদ্ধরা ব্যাপকভাবে মুসলমান হয়েছে বখতিয়ার খলজীর সময় থেকে। কথাটা ঠিক নয়; কারণ পূর্ববঙ্গের

https://nagorikpathagar.org

অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে হিন্দু ধর্মই অজানা ছিল। এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের পূর্ববঙ্গের মানুষের পেশা নিয়ে আগে কথা বলতে হবে। বাঙালীর আদি মূল পেশা ছিল মৎস্যশিকার, মানে মেছুয়া। বাঙালী, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাঙালী, কৃষিজীবী হয়েছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। গঙ্গা নদী খাত পরিবর্তিত হয়ে পদ্মা নদী তৈরী হওয়াটা এটার কারণ। এর ফলে পূর্ববঙ্গে আবাদযোগ্য অনেক জমির সৃষ্টি হয়। ফলে তখনকার শাসক মুঘলদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের ভরকেন্দ্র পূর্ববঙ্গে ঝুঁকে পড়ে। এর আগে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ।

– তার মানে পদ্মা নদী সবসময় ছিল না?

– না, ছিল না। নদী গতিপথ পাল্টায় নানা কারণে। পুরনো নদীখাত ছেড়ে নতুন পথে নদী সাগরে মেশে। এটাই নদীর প্রকৃতি।

পূর্ববঙ্গের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে মুঘলরা নীচু চোখে দেখতো। বাঙালীর মাছ ধরা আর খাওয়ার অভ্যাস ছিল মুঘলদের কাছে বিরক্তিকর। এটা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ১৬২০ সালে দুজন মুঘল অফিসার কথা বলছে এভাবে। এখানে একজন মুঘল অফিসার আরেকজনের রণকৃতিত্বকে খাটো করছে।

প্রথমজন বলছে : খালো পাড়ার বাঁশের বেড়া তোলা একদল মৎস্যজীবীকে ছাড়া আর কোনো বিদ্রোহীকে তুমি দমন করেছো?

তাঁর সহ-অফিসার বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে : বাঙলায় মুঘলদের প্রভাবশালী উপদেষ্টা ঈশা খাঁ এবং মুসা খানও তো মৎস্যজীবী। তোমাদের খুশী করার জন্য সুলেমান কাররানির

https://nagorikpathagar.org

পুত্র দাউদের মতো যোদ্ধা আমি কোথায় পাবো? সম্রাটের অফিসার হিসেবে আমার কর্তব্য হলো, মুঘলবিরোধী প্রতিটি শত্রুকে দমন করা। তারা মুঘল হোক, মেছুয়া হোক আর আফগানই হোক। (সুলেমান কাররানির পুত্র দাউদ ছিল আফগান বিদ্রোহী)

মৎস্য থেকে কৃষিতে আসা পূর্ব-বাঙলার মানুষ প্রথম যেই সংগঠিত ধর্মের সাথে পরিচিত হয় সেটা হচ্ছে ইসলাম। বাঙলার পূর্বাঞ্চলে সপ্তদশ শতকের আগে জনসংখ্যা পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ছিল। অধিকাংশ এলাকাই ছিল দুর্গম গহীন শালের জঙ্গল।

– তাহলে পূর্ববঙ্গে কি তেমন কোনো জনবসতি ছিল না?

– ১২০৪ সালে তুর্কী বিজয়ের আগে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় আর্য সভ্যতার শিকড় ছিল গভীর অর্থাৎ সেখানে বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল। বর্ধমানবাসী কবি মুকুন্দরাম বর্ণভেদক্লিষ্ট সেই সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই বর্ণভেদ প্রথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গ ছিল হিন্দু-সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীর উপত্যকা ধরে কিছু বসতি থাকলেও বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী ছিল অনগ্রসর এবং তাঁদের হিন্দু ধর্ম বা সংস্কৃতি খুব অল্পই স্পর্শ করেছিল। ইতিহাসবিদেরা বলেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুধর্মের অনুসারীরা পূর্ণ হিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি।

– তাহলে তুমি বলছো, পূর্ব বাঙলায় নদীর গতিপথ বদলে অনেক ফসলী জমি হয়েছে?

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। পূর্ব বাঙলায় নতুন ফসলী জমি তৈরী হওয়ায় আকবরের সময় থেকে জঙ্গল কেটে আবাদী জমি তৈরী

https://nagorikpathagar.org

করার কাজে অসংখ্য পরিশ্রমী মানুষ নিয়োজিত হয়। সেই জমিতে কোনো খাজনা দিতে হতো না। এই নিষ্কর জমিতে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে একটি মন্দির অথবা মসজিদ স্থাপন বাধ্যতামূলক ছিল। এই জমিগুলোই দেবোত্তর সম্পত্তি বা ওয়াকফ এস্টেট বলে আমরা জানি। মুঘল আমলের নথি অনুসারে জঙ্গল কাটা মানুষদের স্থাপিত মন্দিরের চাইতে মসজিদ অনেক অনেক বেশী ছিল। কারণ মূলত মুসলিমরাই এই জঙ্গল কাটার নেতৃত্ব দিতো।

– এই জঙ্গল কাটার নেতারা কোথা থেকে এসেছিলেন?

– জঙ্গল কাটার নেতারা অধিকাংশ এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। এবং তাঁদের অনুসারীরা সেই নেতার উপর তাঁদের মৃত্যুর পরে দেবত্ব আরোপ করে। তাঁদেরকে পীর হিসেবে মেনে নেয়। গড়ে ওঠে দেবোত্তর সম্পত্তির পাশে সেই নেতার মাজার। মজার বিষয় হচ্ছে ইসলামে মাজার নিষিদ্ধ হলেও বাঙলার মুসলিম নেতারা মাজারেই এখনো নন্দিত হন। বাঙলায় লোকায়ত ধর্মের সাথে ইসলামের একধরনের ফিউশন হয়।

– এই ঘটনা আমরা কীভাবে জানতে পারলাম?

– সেই সময়ের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই জঙ্গল কাটার উপাখ্যান আছে। দেখো :

পশ্চিম থেকে এল জাফর মিয়া
তার সঙ্গে বাইশ হাজার লোক
তাঁদের হাতে সুলেমানের দেওয়া পুঁতি
তাঁরা গাইছিল পীরের নাম এবং ঈশ্বরের নাম

https://nagorikpathagar.org

জঙ্গল পরিষ্কার করে শয়ে শয়ে বিদেশী
এল এবং প্রবেশ করলো জঙ্গলে
কুঠারের শব্দ শুনে
ভয় পেলো বাঘ, এবং ছুটে পালালো ব্যাঘ্র নিনাদে...

– তার মানে কৃষি এবং কৃষিজমি তৈরীর সাথে পূর্ব বাঙলায় মুসলমান জনসংখ্যার একটা সম্পর্ক আছে।

– ভেরি গুড, টাট্টু পুটুম। বাবা হেসে উঠলেন জোরে। তার মানে পূর্ব বাঙলায় তলোয়ার দিয়ে ইসলাম কায়েম হয়নি। ইসলাম কায়েমের নেতা ছিল পরিশ্রমী কিছু মানুষ, যারা পূর্ববঙ্গে লোকায়ত ইসলাম এবং কৃষির প্রবর্তন একইসঙ্গে করেছেন। কিছু জোর-জবরদস্তি নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু সেটাই পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রসারের নির্ধারক কারণ নয়। এই সত্যটা জানা জরুরি।

– কেন এই সত্যটা জানা জরুরি?

– কারণ এই সত্য গ্রহণ করলে হিন্দুদের পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগার প্রয়োজন হবে না, মুসলিমদের আত্মগর্বী হয়ে অপর সম্প্রদায়কে তাচ্ছিল্য করতে হবে না। এই উপলব্ধি বাঙলাদেশে খুব দরকারি। বাঙালী জাতির দুই ধর্ম সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আনার জন্য ইতিহাসের ধূলি কালি সরিয়ে সত্যের উন্মোচন জরুরী।

– এই তথ্য তুমি কোথা থেকে জানলে?

– বাবা হেসে বললেন, রিচার্ড এম ইটন বলে একজন গবেষক এগুলো উদঘাটন করেছেন। তাঁর বইটা অনুবাদ হয়েছে বাঙলায়। নাম 'বঙ্গীয় মুসলিম কাহারা : বাঙলার ধর্মান্তর এবং ইসলামীকরণ সম্পর্কে কিছু কথা'।

https://nagorikpathagar.org

সুলতান গিয়াসউদ্দিনের স্বর্ণযুগ

আমি তখন কবি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কথা ভাবছিলাম। বাবা বললেন, আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসি। কোথায় ছিলাম আমরা?

– আমি চমকে উঠে বলি, বখতিয়ার খলজী মারা গেলেন, তারপর থেকে।

– ঠিক। তার মৃত্যুর পর কিছুদিন জুড়ে চললো হত্যা আর ধ্বংস। এক রাজা যায় আরেক রাজা আসে। এ ওকে মারে তো ও তাকে মারে। শেষ পর্যন্ত বঙ্গের সিংহাসনে বসেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন।

– সুলতান গিয়াসউদ্দিন তাহলে কাকে মেরে সিংহাসনে বসলো? আমি মজা করে জানতে চাই।

– সুলতান আলাউদ্দিনকে খুন করে। এই সুলতান আলাউদ্দিন কে ছিল জানো? এই হচ্ছে সেই বখতিয়ারের সেনাপতি আলী মর্দান, যে নিজের প্রভুকে রোগশয্যায় হত্যা করে সুলতান আলাউদ্দিন নাম ধারণ করে বাঙলার সিংহাসনে বসে।

https://nagorikpathagar.org

অতি সাধারণ একজন তুর্কী গর্দভচালক গিয়াসউদ্দিন নিজের যোগ্যতায় বাঙলার সিংহাসনে বসেন। তিনিও তুরস্ক থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন, পরে বখতিয়ারের বাহিনীতে যোগ দিয়ে সেনাপতির পদে উন্নীত হন। বাঙলার সিংহাসনে বসেই তিনি দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাঙলার ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন লোকপ্রিয় শাসকও। গিয়াসউদ্দিনের রাজধানী ছিল গৌড়।

– সেখানে কি রাজপ্রাসাদ আছে এখনো?

– না নেই। কারণ, বাঙলার নদী আর এর নিরন্তর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য উত্তরবঙ্গের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়া আর সব নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তেমনিভাবে বিলীন হয়েছে বাঙলার রাজধানী গৌড়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালেই চেঙ্গিস খান মধ্য এশিয়া আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে মুসলিম পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে আর বাঙলায় চলে আসেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন এইসব বিদ্বানকে পুনর্বাসিত করেন। ফলে বাঙলায় তাঁদের মাধ্যমেই সুফি আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটে। সেই সময় সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজ্যসীমা অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কয়েকটি সামরিক ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন দিল্লীর কাছে পরাজিত হন এবং বাঙলা দিল্লীর করতলগত হয়।

এর পরে প্রায় ষাট বছর ধরে মামলুক বা দাসগোষ্ঠী বাঙলা শাসন করে।

– দাসেরা রাজা হয়? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

https://nagorikpathagar.org

– ইসলামে ক্রীতদাস শব্দের অর্থ একটু ব্যাপক। ইসলামের রীতি অনুসারে বহুক্ষেত্রে রাজাও যুদ্ধে পরাজিত হলে দাসের পর্যায়ে অবনমিত হতেন। এমনকি পরাজিত ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও দাসের পর্যায়ে অবনমিত হতেন। 'দাস' শব্দটির প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় আবদ, ফারসী ভাষায় বান্দা ও তুর্কী ভাষায় মামলুক। বঙ্গের দাস রাজারা তুর্কী গোত্রীয় ছিল বলেই এই বংশকে মামলুক বংশ বলা হয়। দিল্লীর নির্দেশানুসারে এই দাস-রাজারা বাঙলার মসনদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং শাসন করতেন।

এই দাস-রাজাদের মধ্যে মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন মুগিসউদ্দিন উজবুকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মুগিসউদ্দিন উজবুকের জীবন ও শাসনকাল ছিল অতিবিচিত্র। তিনি দিল্লীর নিয়োগ পেয়েই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সুলতান উপাধি ধারণ করেন। সাহস, শক্তি ও বাহুবলে তিনি বাঙলা রাজ্যের সীমান্ত বাড়িয়ে প্রায় দিল্লীর সমান একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। এরপর তার ইচ্ছা হয় আসাম আক্রমণ করার। তোমার নিশ্চয় মনে আছে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী একইভাবে তিব্বত আক্রমণ করতে গিয়েই পরাজিত এবং নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। সেই একই ভুল করলেন মুগিসউদ্দিন উজবুক। আসাম আক্রমণ করলেন উনি বসন্তকালে। আসাম-রাজা দলবল ও সৈন্যসহ পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। তখন সহজ জয়ের আনন্দে মুগিসউদ্দিন উজবুক দিশেহারা। সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। দলবল নিয়ে আনন্দ-উল্লাস আর লুটপাটে ব্যস্ত রাখলেন নিজেকে। এর মধ্যে বর্ষা এলো। আসাম অঞ্চলের বর্ষা ভয়ানক। তুমি তো সিলেটের হাওর দেখেছ।

– হ্যাঁ, সমুদ্রের মতো বিশাল এলাকা, শুধু পানি আর পানি। আর কী সব বড় বড় ঢেউ।

https://nagorikpathagar.org

– হ্যাঁ, হাওর এলাকা বর্ষা এলেই একেকটা সমুদ্রের মতো বিশাল জলাভূমি হয়ে ওঠে। আসাম রাজা এ সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। চারিদিকে অথই পানি। ঘোড়ার ঘাস নেই, সৈন্যের খাবার নেই, চলাচলের নৌকা নেই। এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মুগিসউদ্দিন উজবুক এবার পালাতে শুরু করলেন আসাম থেকে। পালাতে চাইলেই কি আর পালানো যায়? আসাম-রাজা ছাড়বেন কেন? আসামের সেনারা পালানোর পথে মুগিসউদ্দিন উজবুকের সমস্ত সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিলো আর মুগিসউদ্দিন উজবুককে বন্দী ও নিহত করলো।

– উজবুক মানে যে বোকা তাহলে এই কথাটা ঠিক? আমি হাসতে থাকি।

– ঠিক জানি না, তবে হলেও হতে পারে। মুগিসউদ্দিন উজবুকের নির্বুদ্ধিতায় বাঙালী হয়তো উজবুক মানেই বোকা ভাবে। বাবাও হাসতে থাকে।

বড় হলে তুমি এমন ঘটনা দেখবে ইতিহাসে অনেক জায়গায় ঘটেছে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন রাশান সৈন্য বিনা বাধায় মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার ঠিক রাশান শীতে নাস্তানাবুদ হয়ে যখন নেপোলিয়ন পালাচ্ছিলেন মস্কো ছেড়ে তখন রাশান সৈন্য আক্রমণ করে ফরাসী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তাই মনে রাখবে, যুদ্ধে এটাকে বলে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ, যা শেষ পর্যন্ত তোমাকে বিজয়ী করবে।

আমি বেশ খুশী হয়ে উঠি কৌশলগত পশ্চাদপসরণের বিষয়টা ভেবে। বন্ধুদের সাথে নানা সময়ে এটা কাজে লাগানো যাবে। বাবা বলে চলে।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার মাটিতে বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বীজ

১২২৭-১২৮২ সাল পর্যন্ত মোট ১৬ জন শাসনকর্তা লক্ষ্ণৌতির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে লক্ষ্মণাবতীর কোনো শাসনকর্তাই দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেননি। সুলতান মুগিসউদ্দিন তুগরিল ১৬ জন শাসনকর্তার মধ্যে শেষ ব্যক্তি ছিলেন।

তুর্কী-পরবর্তী শাসকদের মধ্যে তুগরিল ছিলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। উত্তর ও পশ্চিম বাঙলা ছাড়াও ঢাকা ও ফরিদপুরের বেশ কিছু অঞ্চল তিনি অধিকারে আনেন। তিনি সোনারগাঁয়ের কাছে নারকিলা নামের একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গটি তুগরিলের কিল্লা নামে পরিচিত। তুগরিল 'মুগিসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। বলবন লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তার ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই তাঁকে দমন করার জন্য তিনি বাঙলা আক্রমণ করেন। দিল্লীর সুলতান বলবন প্রচণ্ড আঘাত হানেন

https://nagorikpathagar.org

তুগরিলের উপর। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে বলবনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন তুগরিল।

তুগরিলের মৃত্যুর পরে একচল্লিশ বছর সুলতান বলবনের বংশ বাঙলা শাসন করে। সুলতান বলবনের পুত্র বুগরা খান ছিলেন বাঙলার বলবন বংশের প্রথম শাসক। প্রথম বঙ্গের সুলতান বুগরা খানকে নিয়োগ করেন তাঁর পিতা বলবন খান। বুগরা খানের নাম অনুসারে বগুড়ার নামকরণ হয়েছে। বুগরা খান তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে নিজেকে বঙ্গের সুলতান ঘোষণা করেন।

– তার মানে স্বাধীনতা ঘোষণা?

– সেটা বলতে পারো। তবে যেই অর্থে এখন স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়টা আমরা শুনি, সেই অর্থে নয়। যিনি রাজা হবেন তাঁকে নিজেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হতো, কোনো সেনাপতি দিলে চলতো না।

– বাঙলা কেন সবসময় স্বাধীন হতে চাইতো?

– এটা একটা ভালো প্রশ্ন। তুমি লক্ষ করলে দেখবে, বাঙলার জলবায়ুতে একটা বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। দিল্লীর কাছে বাঙলা চিরকাল একটা সমস্যা। দিল্লী থেকে বাঙলার ভৌগোলিক দূরত্ব, অসংখ্য নদনদী, বাঙলার ঘন বর্ষা, বাঙলার হস্তী সৈন্য, বাঙলার মশা, ম্যালেরিয়া দিল্লীর সুলতানদের ক্রমাগত বিব্রত করেছে। বিদ্রোহ ছিল বাঙলার মানুষের মনে, রক্তে, মজ্জায়। বাবা বলে।

– দিল্লীর সুলতান বাঙলাকে এত ভয় পেতো?

– ভয় পেতো বললে ভুল হবে, দিল্লী বাঙলাকে নিয়ে সবসময়

https://nagorikpathagar.org

অস্বস্তিতে ভুগতো। বুগরা খান দিল্লীর সুলতান হতে পারতেন কিন্তু এই বঙ্গের মায়া কাটাতে পারলেন না। বলবনের মৃত্যুর পরে বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান হন। তখন একটা মজার ঘটনা ঘটে। কায়কোবাদ খুব উচ্ছৃঙ্খল জীবন শুরু করলে এবং অনাচার শুরু করলে তাঁর বিরুদ্ধে বুগরা খান যুদ্ধযাত্রা করেন এবং শেষ অবধি অবশ্য পিতা-পুত্রের যুদ্ধ হয় না।

– বাবা-ছেলের যুদ্ধ? আমি খুব মজা নিয়ে প্রশ্ন করি।

– হ্যাঁ, ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে। পারস্যের একটা কাহিনী আছে সোহরাব-রুস্তম নামে। মহাবীর রুস্তম ভুল করে তার ছেলেকে যুদ্ধে মেরে ফেলেন।

– সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কী হলো?

– সেই যুদ্ধে বাবা আর ছেলের মিলন হয়। যদিও কুচক্রী মন্ত্রীরা চেয়েছিল যুদ্ধ হোক আর বুগরা খান পরাজিত হোক।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলা প্রেমিক বাঙালী রাজা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

এবারও কি বিদ্রোহের গল্প বলবে? আমি বলি।

– না, এবার প্রেম আর ভালোবাসার গল্প বলবো। বাবা বলে।

আমি হেসে ফেলি। রাজা-বাদশাহদের প্রেম?

– না, মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম। বাঙলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন সেরা। তিনিই বাঙলাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবেসেছিলেন। তাঁর রাজ্য কামরূপ (বর্তমান পূর্ব-আসাম), কামতা (বর্তমান কুচবিহার এলাকা), জাজনগর (উড়িষ্যার পূর্ব দিকের অংশ) এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

– সেরা কেন? কী করেছেন উনি?

– উনার সময়েই শ্রী চৈতন্য এসেছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

– শ্রী চৈতন্য কে?

– এক মহান মানবতাবাদী ধর্ম সংস্কারক। তিনি হিন্দু ধর্মের মানবিক সংস্কার করেছিলেন। উনার জন্মও কিন্তু পূর্ববঙ্গে ছিল। সিলেট অঞ্চলে। একদিকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু ভক্তিবাদ ও অন্যদিকে মুসলিম মরমী সুফি-সাধকদের দ্বারা প্রচারিত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বাঙলার গোটা সমাজজীবনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল।

এই সময় ছিল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য স্বর্ণযুগ। হুসেন শাহের সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাভারত' ও 'ভগবদ্গীতা' প্রথমবারের মতো সংস্কৃত থেকে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়। বস্তুত এই সময়কাল থেকে বাঙালীর জীবনে উদার সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় সে-কালের কতিপয় হিন্দু-মুসলমান কবির রচনায়।

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

মানুষকে সবার উপরে স্থাপন করেছিল বাঙলা। পঞ্চদশ শতকের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের এই অমর বাণীতে যেমন আমরা মানবতাবাদের জয়গান শুনতে পাই, তেমনি সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি আবদুল হাকিম রচিত 'নূরনামা'য় এক উদার সমন্বয়ধর্মী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের প্রতি সমানভাবে এই বাঙালী মুসলমান কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এইভাবে :

য়াল্লা (আল্লাহ) খোদা-গোঁসাই
সকল তান (তাঁর) নাম
সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম।

https://nagorikpathagar.org

হুসেন শাহী বংশ ছিল পাল রাজাদের পরে আরেক খাঁটি বাঙালী শাসক। উনারা জাতিতে আরব, ধর্মে মুসলমান এবং সংস্কৃতিতে বাঙালী।

– আরব থেকে বাঙালী হয় কীভাবে?

– বাঙালী সংস্কৃতি গ্রহণ করে, বাঙলা ভাষায় কথা বলে, বাঙলায় থেকে গিয়ে নিজের ভাগ্যকে বাঙলার সাথে মিলিয়ে যে নেবে সেই তো বাঙালী। তাই না?

এই হুসেন শাহী বংশের আমলে বাঙলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। হুসেন শাহী সুলতানেরা ছিলেন যুদ্ধে কুশলী ও শাসনে প্রজা-কল্যাণকামী। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হলেও হিন্দু প্রজাদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন। হিন্দুরা তাঁকে 'নৃপতি তিলক' উপাধি দিয়েছিলেন। সমসাময়িক হিন্দু কাব্যে তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলে সম্মান জানানো হয়েছিল।

নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্রেশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার ॥

হুসেন শাহ ছিলেন আকবরের মতো মহান রাজা। দুর্ভাগ্য যে তাঁর এমন কোনো কবিবন্ধু ছিল না যাঁরা তাঁর কীর্তিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় করে রাখতে পারতেন।

– তার মানে রাজাদের সাথে কবি-লেখকদের বন্ধুত্ব থাকতে হয়?

– হ্যাঁ, হতো সেই সময়। কারণ লেখকরাই রাজাদের কীর্তি

https://nagorikpathagar.org

লিখে রাখতো। তাঁরা রাজাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করতো। সভায় একজন সভাকবি থাকতো। তোমাকে তো আগে বলেছি, মোঙ্গলরা লিখতে পারতো না বলে চেঙ্গিস খানের মতো এত বড় বীরের কোনো লিখিত কীর্তি নেই। আছে শুধু বদনাম। কারণ যারা হেরেছে তারাই চেঙ্গিস খানকে নিয়ে লিখেছে। কে আর পরাজিত হয়ে বিজয়ীর গুণগান করে?

হুসেন শাহী বংশের মধ্যে কোনো বহির্ভারতীয় প্রেম ছিল না। তাঁরা বাঙলাকে ভালোবেসেছেন, বাঙলার কল্যাণ কামনা করেছেন, বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে এর বিকাশকে উৎসাহিত করেছেন। মুসলিম শাসক হয়েও তাঁরা হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ দিয়েছেন। দিল্লীর বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সেই সেনাপতিরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগানদের হাতে হুসেন শাহী বংশের পরাজয় ঘটে এবং বাঙলাদেশে আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিক থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলাদেশ দিল্লী সালতানাতের অধীনে ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ আফগান (পাঠান) সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ বাঙলার প্রায় সমস্ত অঞ্চল জয় করে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং বাঙলাদেশে স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন। বাঙলার স্বাধীন সুলতান 'শাহী বাঙ্গালা' উপাধি ধারণ করেন। পরবর্তী প্রায় দুইশো বছর বাঙলাদেশে স্বাধীন পাঠান সুলতানরা রাজত্ব করেন। এইসব পাঠান সুলতান বহিরাগত হলেও এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুসেন শাহী আমলে বাঙলার ভাবজগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

সোনারগাঁ আর পানাম নগর

তুমি আমাকে এখনো বাঙলার কোন রাজার সমাধি দেখালে না কেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

– একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। বাংলাদেশে মাত্র একটা রাজার কবর চিহ্নিত করা গেছে আর তিনি হচ্ছেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। বাবা বলে।

– তাই নাকি? আমি অবাক হই। মাত্র একজন রাজার সমাধি আছে জেনে।

– আমরা যেদিন সোনারগাঁ যাবো সেদিন তোমাকে নিয়ে যাবো। কিন্তু তার আগে তো তোমাকে জানতে হবে কেমন ছিলেন এই শাসক।

– কেমন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ?

– তিনি ছিলেন একজন বিশ্ব মানের কবি। কবিদের সমাদরও করতেন খুব। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রবিনিময়

https://nagorikpathagar.org

হতো। বাঙালী মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত রচনা "ইউসুফ জুলেখা" লেখা এ সময়ে শেষ করেন। এ সময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করা হয়। তিনি কবি হাফিজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই সম্মান পেয়ে তিনি সুলতানকে একটি গজল রচনা করে পাঠান।

– তাই? কী ছিল সেই গজলে লেখা?

– গজলে লেখা ছিল :

শক্কর শিকন শওন্দ হমাঃ তূতিয়ানে হিন্দ।
যী কন্দে ফারসী কেঃ ব-বঙ্গালাঃ মী রওদ ॥
হাফিয যে শওকে মজ্লিসে সুলতানে গিয়াস্দীন।
গাফিল ম-শও কেঃ কারে তূ আয নালাঃ মী রওদ ॥'

এর বাঙলা হচ্ছে–

ভারতের তোতা হবে মিষ্টি-মুখো সকল-ই,
ফারসীর মিছরী যবে বাঙ্গালায় চলিছে ॥
হে হাফিয! গিয়াসুদ্দীন শাহের সভার বাসনা
ছেড়ো না, কাজ তোমারি কাঁদা-কাটায় চলিছে ॥

– খুব একটা মজা পেলাম না। আমি বললাম।

– ফার্সী খুব ছন্দময় ভাষা। হয়তো অনুবাদটা ভালো হয়নি তাই তোমার ভালো লাগেনি।

– আর কী কারণে তাঁর শাসনামল বিশেষ গুরুত্বের?

– তিনিই প্রথম ভিনদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

https://nagorikpathagar.org

করেন। সেই সময়ের চীনের সম্রাট ইয়ং লির সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল; তিনি চীনে তিনবার দূতও পাঠান। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনায়ও দূত প্রেরণ করেন। এই দুই স্থানে গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে দুটি মাদ্রাসা নির্মাণে তিনি আর্থিক সাহায্য দেন।

– মক্কা-মদিনায় তাহলে বাঙলার আর্থিক সাহায্যে মাদ্রাসা তৈরী হয়েছে? আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

– হ্যাঁ, হয়েছে।

আমরা ঢাকায় ফিরে এসেছি বগুড়া থেকে। বগুড়া থেকে ইতিহাসের অনেক ঘটনা জেনে গেলাম এর মধ্যেই।

– বগুড়া থেকে আমরা কেন শুরু করলাম আমাদের ইতিহাস?

– কারণ বগুড়ার আশপাশকে কেন্দ্র করে বলা যায় বাঙলার ইতিহাস প্রায় ১৪০০ সাল পর্যন্ত চলেছে। তাই শুরুটা ওখান থেকেই।

– এরপর আমরা কোথায় যাবো?

– এরপর আমরা সোনারগাঁ যাবো। সেখানে আছে আমাদের ইতিহাসের আরেক অংশ।

কয়েকদিন পরেই আমরা চলেছি সোনারগাঁ। বাঙলার প্রাচীন আরেক রাজধানী। সোনারগাঁ ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে। পথে বাবা বলে যেতে থাকে।

এই এলাকা ছিল এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সোনারগাঁর প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম। ত্রয়োদশ শতকে বিক্রমপুরের রাজা দানুযমদেব

https://nagorikpathagar.org

দশরথদেব তাঁর রাজধানী বিক্রমপুর থেকে সোনারগাঁয়ে নিয়ে আসেন। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সোনারগাঁ অঞ্চল অধিকার করেন। সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ছিলেন বাঙলার স্বাধীন সুলতান, সোনারগাঁ ছিল তাঁর রাজধানী। বাঙলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। বারো ভুঁইয়া কারা তোমাকে পরে বলছি।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লীর সুলতানদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

ততক্ষণে আমরা ঢাকার বিখ্যাত জ্যাম ছাড়িয়ে সোনারগাঁ পৌঁছে গেছি। সোনারগাঁ এসে আমরা গেলাম প্রথমে পানাম নগর। বাবা বলে চলে।

পানাম নগর ছিল সেই সময়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত আর পরিকল্পিত এক নগর। পানামের বাড়ীগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত

– এই বাড়ীগুলো কত উঁচু হতো?

– দেখতেই তো পাচ্ছো, এগুলোর উচ্চতা একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত হতো।

– বাঙলাদেশের বাড়ীগুলো কি এমনই হতো?

– না, তা ঠিক নয়। এই বাড়ীগুলোর স্থাপত্যে মুঘল, গ্রীক এবং গান্ধারা স্থাপত্যশৈলীর সাথে স্থানীয় কারিগরদের শিল্পকুশলতার সংমিশ্রণ হয়েছে।

– বাড়ীগুলো তৈরীতে কী কী ব্যবহার করা হয়েছে?

https://nagorikpathagar.org

– এগুলো তৈরীতে ইটের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ঢালাই লোহার ব্র্যাকেট, ভেন্টিলেটর আর জানালার গ্রিল। মেঝেতে রয়েছে লাল, সাদা, কালো মোজাইকের কারুকাজ। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই খিলান ও ছাদের মাঝের স্থানে নীল ও সাদা ছাপ দেখা যায়। এছাড়া বাড়ীগুলোতে নকশা ও কাষ্ট আয়রনের কাজ নিখুঁত। কাষ্ট আয়রনের এই কাজগুলো ইউরোপের কাজের সমতুল্য বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

– কাষ্ট আয়রন কী?

– মানে ঢালাই করা লোহা। ছাঁচ তৈরী করে লোহা ঢালাই করা হয়েছে বাড়ীগুলো বানানোর জন্য। এর সাথে আছে সিরামিক টাইলসের কাজ।

– সিরামিক টাইলস তখনও পাওয়া যেতো? আমি অবাক হয়ে বলি।

– হ্যাঁ, যেতো। প্রত্যেকটা বাড়ীই অন্দরবাটী এবং বহির্বাটী এই দুই ভাগে বিভক্ত। বেশীরভাগ বাড়ীর চারিদিকের ঘেরাটোপের ভিতর আছে উন্মুক্ত উঠান। এটাই পরবর্তী সময়ে বাঙালী অভিজাত বাসগৃহের মডেল হয়েছে। তুমি রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ী দেখতে গেলেও ঠিক এই ধরনের ডিজাইন দেখতে পাবে।

পানাম নগরীর পরিকল্পনাও নিখুঁত। নগরীর পানি সরবরাহের জন্য দুই পাশে দুইটি খাল ও পাঁচটি পুকুর আছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই আছে কুয়া বা কূপ। নগরীকে জলাবদ্ধতামুক্ত রাখতে করা হয়েছে খালের দিকে ঢালু। প্রতিটি বাড়ী পরস্পরের থেকে সম্মানজনক দূরত্বে রয়েছে। নগরীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে এর একমাত্র রাস্তা, যা এই নগরীর মাঝখান দিয়ে গেছে।

https://nagorikpathagar.org

– এই পানাম নগরে থাকতো কারা?

– সেই সময়ের অভিজাত রাজপুরুষ, ব্যবসায়ীরা থাকতো এই শহরে। এই সময়ে বাঙলায় আরেকটা যুদ্ধ শুরু হয়। রাজা গণেশের কাছে ইলিয়াস শাহী বংশের পরাজয় হয় এবং বাঙলায় রাজা গণেশের হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয় এবং তা প্রায় ৩২ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়।

– রাজা গণেশ আবার কোথা থেকে আসলেন?

– রাজা গণেশ রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার ছিলেন। তিনি পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে ইলিয়াস শাহী বংশের দুর্বল সুলতানের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে বাঙলার রাজা হন।

রাজা গণেশের পুত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালুদ্দিন নামে গণেশের মৃত্যুর পরে বাঙলা শাসন করেন। জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের পরে তার পুত্র শামস উদ্দিন আহমেদ শাহ ও পরবর্তী সময়ে তাঁর পৌত্র আহমেদ শাহ বাঙলার সুলতান হন। কিন্তু আহমেদ শাহকে তৎকালীন সভ্রান্ত বংশীয়রা একত্র হয়ে সিংহাসনচ্যুত করে ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে বাঙলার সিংহাসনে বসায়। এরপর এই দ্বিতীয় দফায় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান হন জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ। তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে শ্রীহট্ট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর এক হাবসি সেনাধ্যক্ষের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

– হাবসি মানে কী?

– হাবসি একটা জাতি। এদের বাস মূলত ইথিওপিয়ায়।

https://nagorikpathagar.org

সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য, রুকনউদ্দিন বরবক্ আফ্রিকা এবং বিশেষ করে তৎকালীন আবিসিনিয়া (এখনকার ইথিওপিয়া) থেকে বহু হাবসি ক্রীতদাস এনেছিলেন। কালক্রমে এরাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

– হাবসি শব্দটা তাহলে আবিসিনিয়া থেকে এসেছে?

– ঠিক তাই। সেই হাবসি সেনাপতির নাম ছিল মুজফ্ফর। তিনি ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করে ক্ষমতায় চলে আসেন। কিন্তু হাবসিদের কুশাসনের জন্য বাঙলায় আবার ঘোরতর অরাজকতা সৃষ্টি হয়। এই কারণে এদের শাসনামলকেও অন্ধকার যুগ বলা হয়। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হাবসি শাসন চলে। এই সময় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হুসেন শাহ্র নেতৃত্বে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা মুজফ্ফরকে হত্যা করে। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। এবং সূচিত হয়, হুসেন শাহী রাজবংশের।

– এভাবে একটা রাজবংশ শুরু হলো?

– হ্যাঁ, এভাবেই।

https://nagorikpathagar.org

বারো ভুঁইয়া

বাবা বলেন, এবার আমরা বাঙলার বারো ভুঁইয়ার গল্পে যাবো।

মুঘল আমলে বাঙলাদেশের সোনারগাঁ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুসংখ্যক জমিদার স্বাধীন রাজার মতো রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁরা দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করেন। এঁরা বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত। এখানে 'বারো' বলতে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়। সম্রাট আকবর তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র বাঙলার উপর মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তিনি ১৫৭৫ সালে বাঙলা দখল করার পর এ সকল জমিদার ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত এই সকল জমিদাররা হলেন : ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম রায়, হামীর মল্ল, কংসনারায়ণ, রামকৃষ্ণ, পীতম্বর ও নীলম্বর, ঈশা খাঁ লোহানী ও তার সাথে উসমান খাঁ লোহানী।

ঈশা খাঁর রাজত্ব ছিল খিজিরপুর বা কত্রাভু। খিজিরপুর,

https://nagorikpathagar.org

ঈশা খাঁ আর মানসিংহের যুদ্ধ

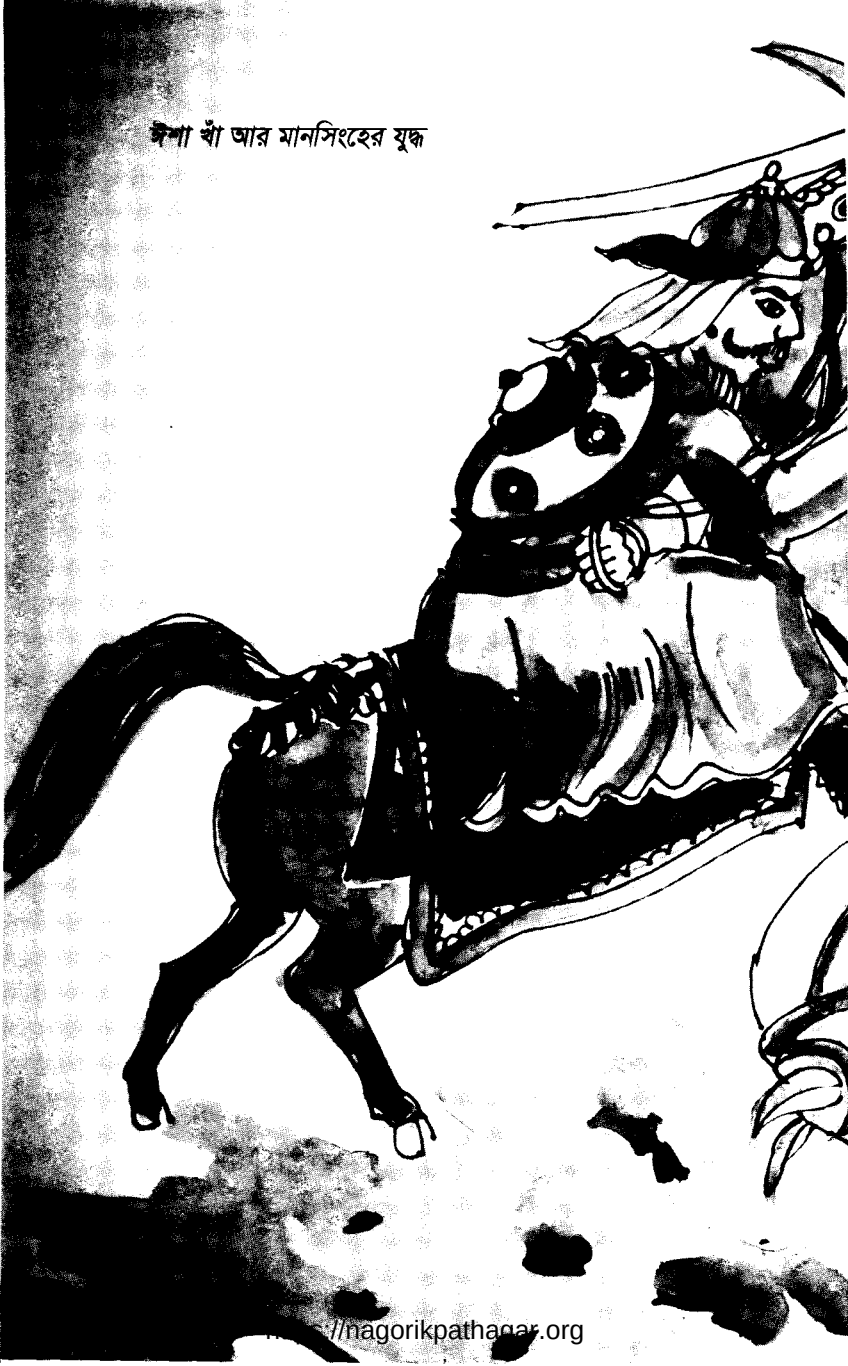

://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

মধ্যযুগের একটি নগর। বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের মাইলখানেক উত্তরে এককালে দুলাই (পুরাতন বুড়িগঙ্গা) ও শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল এই নগর।

প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোর বা চ্যাণ্ডিকান অঞ্চলে। তারপর শ্রীপুর বা বিক্রমপুরে ছিলেন চাঁদ রায়, কেদার রায়। কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা। বরিশালের আদি নাম ছিলো চন্দ্রদ্বীপ।

এরপর লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন ভুলুয়াতে। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাই একসময় এ নামে পরিচিত ছিল। তারপর মুকুন্দরাম রায় ছিলেন ভূষণা বা ফতেহাবাদে। বর্তমান ফরিদপুরের পূর্ব নাম ছিল ফতেহাবাদ।

এরপর ছিলেন ফজল গাজী– তাঁর রাজত্ব ছিল ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপে। মানে বর্তমানের গাজীপুর ও কাশিমপুর। হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর ছিলেন বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার রাজা।

এরপর কংসনারায়ণ– তিনি ছিলেন তাহিরপুর, রাজশাহীর রাজা। উনার সাথে তোমার বগুড়ার দিদিভাইয়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

রামকৃষ্ণের রাজত্ব ছিল সাতৈর বা সান্তোল। এটা ছিল ফরিদপুরের একাংশ। পীতম্বর ও নীলম্বরের রাজত্ব ছিল পুটিয়ায়, যা ছিল রাজশাহীর একাংশ। ঈশা খাঁ লোহানী ও তার সাথে উসমান খাঁ লোহানীর রাজত্ব ছিল উড়িষ্যা ও হিজলী।

মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ বারো ভুঁইয়াদের দমন করতে এলে ঈশা খাঁর সাথে যুদ্ধে তিনি হেরে যান। কথিত আছে, ঈশা খাঁর সাথে তলোয়ার যুদ্ধে মানসিংহের তরবারী ভেঙে যায়।

https://nagorikpathagar.org

– তারপরে, মানসিংহের কী হয়? আমি জানতে চাই।

– ঈশা খাঁ নাকি নিজের তরবারী মানসিংহের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বাবা বলে।

– কেন? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– প্রকৃত বীরেরা তো তাই করে। পরাজিতকে প্রকৃত বীরেরা আঘাত করে না। বাঙালী এটা প্রায়ই ভুলে যায়।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে বারো ভুঁইয়ার প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দাউদ খানকে রাজা মানসিংহ ভাটি এলাকা থেকে সোনারগাঁয় তাড়িয়ে দেন। কেদার রায়কে হত্যা করা হয়। আকবরের মৃত্যুর পরে জাহাঙ্গীর বাঙলার গভর্নর হিসেবে ইসলাম খান চিশতীকে নিযুক্ত করলে তিনি গৌড় থেকে তাঁর রাজধানী ঢাকাতে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ঢাকার নতুন নাম দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরাবাদ। কিন্তু সাধারণ জনতা এই নতুন নাম পছন্দ না করায়, সাধারণভাবে ঢাকা নাম থেকে যায়। ইসলাম খান যশোরের প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করেন এবং ঈশা খাঁর অন্য পুত্রকেও পরাস্ত করে বন্দী করেন। বারো ভুঁইয়ারা একে একে সব পরাস্ত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। স্বাধীন বাঙলার প্রতাপ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলো না, তবে বাঙলাদেশের স্বাধীন গরিমা প্রকাশে এই বারো ভুঁইয়ার অবদান প্রচুর।

https://nagorikpathagar.org

বর্গী এলো দেশে

এবার আমরা আসবো বাঙলার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। যখন আসলেই বাঙলা তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হলো। সেটা জানতে হলে শুরু করতে হবে মুর্শিদ কুলী খাঁ থেকে আর বর্গীদের আক্রমণ নিয়ে। বাবা বলেন।

-মুর্শিদ কুলী খাঁ কে ছিলেন?

-মুর্শিদ কুলী খাঁ ছিলেন বাঙলার প্রথম নবাব। এছাড়াও তিনি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুপরবর্তী প্রথম স্বাধীন নবাব। তার ওপর মুঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র আধিপত্য ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙলার নবাব হয়ে এসে তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান।

-মুর্শিদাবাদ নামটা কি এখান থেকেই এসেছে?

-হ্যাঁ, ঠিক তাই। তখনকার দিনে মুর্শিদ কুলী খাঁ এবং সুজা খান মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক খাজনা হিসেবে কত টাকা দিতেন জানো?

-কত টাকা? কয়েক লাখ হবে। তাই না?

https://nagorikpathagar.org

-না, এক কোটি টাকা দিতেন। সেই সময়ের এক কোটি টাকা বিশাল অঙ্কের টাকা। এ থেকে বোঝা যায়, সেই সময় বাঙলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব ভালো অবস্থা ছিল।

মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সুজাউদ্দিন বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অশান্তি এলে, সেই সুযোগে নাগপুরের মারাঠা মহারাজা রঘুজি উড়িষ্যার সাথে বাংলাদেশের কিছু অংশ দখল করেন। এই মারাঠাদেরকেই বর্গী বলা হয়। মারাঠা বর্গীরা বেশ কিছুদিন বাঙলায় অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়।

-বর্গীরা কি খুব অত্যাচার করতো?

-হ্যাঁ, খুব।

-লুটপাট করতো?

-তুমি কেমন করে জানলে?

-ওই যে একটা ছড়া আছে না– খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?

-বাহ, এই তো মেলাতে পারছো ইতিহাসের সঙ্গে! এই বর্গীর অত্যাচার নিয়ে তোমাকে আরো বলতে হবে।

এর কিছুদিন পরে জাতির বৃহত্তর তুর্কি গোষ্ঠীর সদস্য কিন্তু জন্মগতভাবে ভারতীয় আলীবর্দী খা সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খানকে হত্যা করে মুর্শিদাবাদের নবাব হন।

আলীবর্দী খাঁর কোনো ছেলে ছিল না। তাঁর ছিল তিন কন্যা। তিন কন্যাকেই তিনি নিজে বড় ভাই হাজী আহমদের তিন পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। ছোট মেয়ে আমেনা বেগমের দুই

https://nagorikpathagar.org

ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। এই আমেনা বেগমেরই বড় ছেলে হলেন সিরাজউদ্দৌলা, বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব।

-আর ছোট ছেলের নাম কী ছিল?

-তার নাম ছিল মির্জা মেহেদী। আর সিরাজউদ্দৌলা কিন্তু তাঁর আসল নাম না। তাঁর আসল নাম ছিল মির্জা মোহাম্মদ।

-আলীবর্দী খা কেন বড় মেয়ের সন্তানদের বাদ দিয়ে ছোট মেয়ের ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন?

-আলীবর্দী খা যখন পাটনার শাসনভার লাভ করেন তখন সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। এ কারণে তিনি সিরাজের জন্মকে সৌভাগ্যের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে আনন্দের আতিশয্যে নবজাতককে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সিরাজ তাঁর নানার কাছে ছিলেন খুবই আদরের।

-এবার তাহলে বর্গীর গল্প বলো।

-শুরু করছি দাঁড়াও, একটু দম নিই। বর্গী শব্দটা জাতে ফারসি। সে ভাষার মূল শব্দটা হলো বারগি। আমরা বাঙালিরা মুর্গির মতো বর্গী করে নিয়েছি।

-হা হা হা খুব মজার তো। কিন্তু ওরা তো আর মুর্গির মতো নিরীহ ছিলনা, তাই না?

-হু, সেটা তো বটেই। এই বর্গীদের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন জানো?

-নাতো, কে?

-ছত্রপতি শিবাজী

https://nagorikpathagar.org

-তার মানে মুম্বাইয়ে যে এয়ারপোর্ট আছে, সেটা যার নামে!

-হু, ঠিক তাই। শুধু তাই না। আমাদের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন–'মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজী'

-বলো কি? সর্বনাশ! তিনি এমন দস্যু রাজার বন্দনা করেছিলেন?

-হু, করেছিলেন।

এটা শুনে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বাবা আবার বলতে শুরু করলেন।

-মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের বলা হতো 'পাগা'। এই পাগাদের মধ্যে যাদের রাজার ভান্ডার থেকেই ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হতো, তাদের বলা হতো বর্গী। আর যারা নিজেদের ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই বর্গীদের সাথে লুটপাটে অংশ নিতো, তাদের বলা হতো শিলেদার। এরা যখন লুটপাট করতে বাঙলায় আসতো, তখন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতো। নির্বিচারে গলা কাটতো মানুষের, রক্তের নদী বয়ে যেতো। এই বর্গীর আতংক এমনি ছিল যে, 'ওই বর্গী এলো' এই হাঁক উঠলে কেউ আর কোনোদিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকতো।

-কোন সময়টা এই বর্গীর হামলা হয়েছিল?

-নবাব আলীবর্দী খার শাসন আমলে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত এই নয় বছর।

-শিবাজী কি বাঙলায় এসেছিল?

-না সে আসেনি। এসেছিল নাগপুরের রঘুজির দেওয়ান ভাস্কর কোলহাতকর। ভাস্কর পণ্ডিত নামেই তাকে সবাই চিনতো।

https://nagorikpathagar.org

-তাহলে এই বর্গীর হামলা কীভাবে বন্ধ হলো?

-আলীবর্দীকে বর্গীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে হয়েছে। একবার আলীবর্দী হারে তো, আরেকবার ভাস্কর পণ্ডিত হারে। এদিকে নবাব আলীবর্দীর এক সেনাপতি মীর হাবিব পক্ষ ত্যাগ করে বর্গীদের সাথে যোগ দেয়।

-বল কী! এখানেও বিশ্বাসঘাতকতা?

-হু, তুমি মনে রাখবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরাজয় আসে নিজ দলের বিশ্বাসঘাতকদের কারণে।

তবে আলীবর্দী হারেননি। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে এবং বেশিরভাগ মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করেন। যদিও আলীবর্দী খাকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের ভয়ে তার সেনাপতিদের দাওয়াত করে ডেকে আনতে হয়েছিল।

-দাওয়াত করে ডেকে এনে খুন করা? এটা কি ঠিক হলো? আমি বিস্ময় নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করি।

-অন্যের দেশে লুট করাটা কি ঠিক? নিরাপরাধ লাখ লাখ মানুষের জীবন নেয়া কি ঠিক? সম্পদ নষ্ট করা কি ঠিক?

-না, তা নয়।

-তুমি এখানে আক্রান্ত, বর্গীরা আক্রমণকারী। তাই তোমার ন্যায্য অধিকার আছে, শান্তিতে না পারলে, ছলে-বলে-কৌশলে শত্রুকে পরাস্ত করার। আলীবর্দী খা সেটাই করেছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব

আলীবর্দী খা মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে কিশোর সিরাজ তাঁর সাথী হন। আলীবর্দী সিরোজউদ্দৌলাকে বালক বয়সেই পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বয়স অল্প ছিল বলে রাজা জানকীরামকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়টি সিরাজউদ্দৌলা পছন্দ করেননি। তাই তিনি একদিন গোপনে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে ভ্রমণের নাম করে স্ত্রী লুৎফুন্নেসাকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তিনি সোজা পাটনায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং জানকীরামকে তাঁর শাসনভার ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেন। কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে জানকীরাম তাঁর শাসনভার ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং দুর্গের দ্বার বন্ধ করে বৃদ্ধ নবাবের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দূত পাঠান। অন্যদিকে জানকীরামের আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে সিরাজউদ্দৌলা দুর্গ আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে লড়াই শুরু হয়ে গেলে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। ঘটনার সংবাদ পেয়ে আলীবর্দী খা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌছান এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। সেদিনই আলীবর্দী খা দুর্গের ভেতরের

https://nagorikpathagar.org

দরবারে স্নেহভাজন দৌহিত্রকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা দেন, 'আমার পরে সিরাজউদ্দৌলাই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করবে।'

-সিরাজের তাহলে একটু মাথা গরম ছিল?

-সেটা ঠিক নয়। তাঁর আত্মসম্মান বোধ ছিল প্রবল, তাঁর ওপরে নানার স্নেহ আর অল্প বয়স–এই তিন মিলে তাঁকে কিছুটা বেপরোয়া করে তুলতেই পারে।

ইতিহাসে এই ঘটনাকে সিরাজউদ্দৌলার যৌবরাজ্যাভিষেক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সময় সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার ঘটনা তাঁর আত্মীয়দের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। অনেকেই তাঁর বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলীবর্দী খার বড় মেয়ে ঘসেটি বেগম এবং তাঁর স্বামী নোয়াজেশ মোহাম্মদ।

এ রকম পরিস্থিতিতেই আলীবর্দী খা মৃত্যুবরণ করেন এবং ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজদের সাথে নবাবের বিরোধ বাড়তে থাকে।

-ইংরেজরা কখন এলো এদেশে?

-তাই তো? গল্পে আরো অগ্রসর হওয়ার আগে ইংরেজদের ভারত আগমনের কথা আমাদের বলতে হবে।

ইংরেজরা ১৬০০ সালে লন্ডনে একটি বণিক সম্প্রদায় গঠন করে। এ নতুন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। একজন শাসনকর্তা, একজন সরকারি

https://nagorikpathagar.org

শাসনকর্তা এবং চব্বিশ সদস্যবিশিষ্ট এই কোম্পানিকে রানী পনেরো বছরের জন্য প্রাচ্যে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। প্রথম দিকে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যজাহাজ জাভা, সুমাত্রা, মালাক্কা ও যবদ্বীপের দিকে বাণিজ্য করতে যেতো। কিন্তু ওলন্দাজ অর্থাৎ হল্যান্ডের বণিকেরা ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ করে সেই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিলে ইংরেজরা ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে বাণিজ্যকুঠি তৈরির উদ্যোগ নেয়। এ সময় ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের অনুমতি নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। হকিন্সের আবেদনক্রমে ইংরেজগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সুরাটে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে।

-তাহলে সুরাটই ইংরেজদের প্রথম ঘাঁটি?

-হ্যাঁ। আর বাঙলায় শেষ ঘাঁটি। বাবা বলে। তবে সুরাটে খুব সহজে তারা ঢুকতে পারেনি। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুটি বাণিজ্যজাহাজ সুরাট বন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পর্তুগীজ অর্থাৎ পর্তুগালের নৌবহর গতিরোধ করে। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির ক্যাপ্টেন বেস্ট পর্তুগীজ নৌবহর বিধ্বস্ত করে সুরাটে ঢোকে। ক্যাপ্টেন বেস্টের সাফল্যে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর সন্তুষ্ট হন এবং ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান জারি করে সুরাটে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা আরেকটি নৌযুদ্ধে পর্তুগীজদের পরাজিত এবং বিতাড়িত করে হরমুজ দখল করে। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা জেমসের রাজত্বকালে স্যার টমাজ রো রাষ্ট্রদূত হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তিনি দীর্ঘ তিন বছর মুগল দরবারে অবস্থান করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য কতগুলো বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিন অব ব্রাগান্ডাকে বিয়ে করে যৌতুক হিসেবে

https://nagorikpathagar.org

মোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরটি লাভ করেন। এর কিছুকাল পর বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে তিনি তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিক্রি করেন।

-মুম্বাই তাহলে অনেক আগে থেকেই পর্তুগীজদের দখলে ছিল?

-হ্যাঁ, ফলে পশ্চিম-ভারতে সুরাটের পরিবর্তে মুম্বাই ইংরেজদের শক্তিশালী বাণিজ্যঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের মসলিপট্টমে ইংরেজরা একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু সেখানে দেশীয় বণিক এবং ওলন্দাজদের অবিরাম বিরোধিতার ফলে তারা ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে আরামগাঁও নামক স্থানে অপর একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে বাৎসরিক শুল্ক প্রদানের অঙ্গীকারে গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছ থেকে মসলিপট্টমসহ অন্যান্য বন্দরের বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে। ইতোমধ্যে 'ফ্রান্সিস-ডে' নামক একজন ইংরেজ নাবিক চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের ইজারা লাভ করে সেখানে সেন্ট জর্জ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এর ফলে মাদ্রাজও ইংরেজদের শক্তিশালী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। এরপর ক্রমশ ইংরেজরা উড়িষ্যা, হরিহরপুর, বালাসোর, পাটনা এবং শেষে কাশিমবাজারে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

-আচ্ছা, ইংরেজদের আগমনের কাহিনী শুনলাম। এবার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা বলো।

বাবা আবার বলা শুরু করেন।

আলীবর্দী খার অপর কন্যা ঘসেটি বেগম তাঁর পুত্র শওকত জঙ্গকে বাঙলার ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলীবর্দী খার সিদ্ধান্তে ঘসেটি বেগমের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আলীবর্দী খার শেষ সময়ে বাঙলার সম্পদ লুটপাট করে এক শ্রেণীর

https://nagorikpathagar.org

ধনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। রাজবল্লব, জগৎশেঠ ছিল সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারাও সিরাজের ক্ষমতা নেয়াকে পছন্দ করেনি। আবার ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও অসৎ ব্যবসা করে প্রচুর আয় করতো। তারাও সিরাজের সিংহাসন আরোহণে প্রমাদ গোনে।

-ইংরেজরা প্রমাদ গুনবে কেন? সিরাজের দিক থেকে ইংরেজদের কী ভয় ছিল?

-ইংরেজ কর্মচারীদের অসৎ ব্যক্তিগত ব্যবসা ছিল। আর নতুন তৈরি হওয়া বণিকগোষ্ঠীর আরেক ব্যবসা ছিল দস্তকের অপব্যবহার।

-দস্তক কী জিনিষ?

-দস্তক হচ্ছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মুঘল সরকারের দেয়া ব্যবসার অনুমতিপত্র। সেই ফরমানের শর্তানুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমদানি ও রপ্তানির ওপর শুল্ক না দিয়ে বাঙলায় ব্যবসা করার অধিকার লাভ করে।

-শুল্ক কী?

-শুল্ক মানে ট্যাক্স। ট্যাক্স দিয়েই সরকার রাষ্ট্রীয় খরচের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করে। আমরা যা কিছু ক্রয় করি, তার একটা অংশ ট্যাক্স। সেই ট্যাক্সের টাকা যায় সরকারি কোষাগারে। সেই টাকা দিয়েই সরকার বেতন দেয়, রাস্তাঘাট তৈরি করে।

-ও আচ্ছা। তাহলে ট্যাক্স ছাড়া ব্যবসা তো একটা বিশাল সুবিধা!

-সেটা তো বটেই। কিন্তু ইংরেজরা তাতেও খুশি ছিল না। বিনা ট্যাক্সে ব্যবসা করার রাজকীয় ফরমানের শর্ত অনুযায়ী এ অধিকার কোম্পানির ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার করতে পারার কথা না। কিন্তু বাস্তবে কোম্পানির ব্যবসায়ীরা

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগতভাবে সরকারের চৌকিগুলোয় দস্তক দেখিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসাও ট্যাক্স ছাড়া চালিয়ে নিতো।

-তাহলে তো নবাবের দ্বিগুণ ক্ষতি!

-হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। তাছাড়াও কোম্পানি ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কাছে দস্তক চড়া দামে বিক্রি করতো। এর ফলে তারাও বিনা ট্যাক্সে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে থাকলো।

-বলো কী! এটা তো মহা অন্যায়।

-শুধু তা-ই নয়। তারা দেশীয় বণিকদের কাছেও তা বিক্রি করতো। এর ফলে একদিকে সরকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে কোম্পানি ও তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিকরা ব্যবসায় মার খেতে থাকে।

-কেন অসম প্রতিযোগিতা হবে?

-ধরো, বাংলাদেশে এখন ১০০ টাকার কোনো জিনিষ যদি ক্রয় কর, তাহলে কমপক্ষে ১৫ টাকা ট্যাক্স। তার মানে, যে ব্যক্তি জিনিষটা তৈরি করলো, সে পায় ৮৫ টাকা আর ১৫ টাকা পায় সরকার। এখন যাকে ট্যাক্স দিতে হয় না, সে তো জিনিষটা ৮৫ টাকায় বিক্রি করতে পারবে। আর যে ট্যাক্স দেয়, তাকে বিক্রি করতে হবে ১০০ টাকায় তাহলে কারটা বেশি বিক্রি হবে?

-যেটার দাম ৮৫ টাকা।

-ঠিক তাই। দেশি ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করতো। তাই তাদের জিনিষের দাম বেশি হতো। ফলে কেউ কিনতো না।

-কী কী কারণে?

https://nagorikpathagar.org

-প্রথমত, নওয়াবের অনুমতি ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম নামে দুর্গ নির্মাণ; দ্বিতীয়ত, সরকারি তহবিল তছরুপকারী কৃষ্ণদাসকে (রাজবল্লভের পুত্র) আশ্রয় দেওয়া।

-সিরাজ কি এসব ইংরেজদের জানিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ। সিরাজ ইংরেজদের এই অসন্তোষের কারণ জানান। ঘোষণা দেন–দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করে, বাণিজ্য-সুবিধার অপব্যবহার না করে এবং কৃষ্ণদাসকে হস্তান্তর করলে সিরাজ ইংরেজদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু ইংরেজরা সিরাজের কথায় কান দেয় না।

-তাহলে ছেলে কৃষ্ণদাসের কারণেই রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করে?

-হ্যাঁ, ঠিক।

এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ নওয়াব ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে কাসিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন এবং পরবর্তীকালে কোলকাতা অধিকার করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। সিরাজের কোলকাতা আক্রমণের সময় কয়েকজন ইংরেজ বন্দিকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আটক রাখা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে কয়েকজন মারা গিয়েছিল বলে জন জেফেনিয়াহ হলওয়েল নামে ইংরেজ সিভিল সার্জন দাবি করেন। এ ঘটনা ইংরেজদের ইতিহাসে তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

-হ্যাঁ, আমিও একটা বইয়ে পড়েছি সেটা। সিরাজ কাজটা ভালো করেননি। এইভাবে গাদাগাদি করে যুদ্ধবন্দিদের মেরে ফেলাটা খুব খারাপ কাজ।

-তুমি তো ইংরেজদের লেখা ইতিহাস পড়েছ। অন্ধকূপে বন্দি হত্যার ইউরোপিয়ানদের ইতিহাসে অতিরঞ্জন আছে।

https://nagorikpathagar.org

-মানে? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

-ইউরোপীয়রা দাবি করেছিল যে, ২৬৭ বর্গফুট আয়তনের একটি কক্ষে ১৪৬ জন পূর্ণবয়স্ক ইউরোপীয় সৈন্যকে রাখা হয়েছিল। এই দাবি যে মিথ্যা, সেটা প্রমাণের জন্য পণ্ডিত ভোলানাথ চন্দ্র নামে এক গবেষক একটা খুব মজার পরীক্ষা করেন।

-কীভাবে এটা পরীক্ষা করেছিলেন?

-তিনি দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৫ ফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি স্থানকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে সেখানে ইউরোপীয়দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির ১৪৬ জন বাঙালি কৃষককে ঠাসাঠাসি করেও ঢোকাতে ব্যর্থ হন। অতএব, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তথাকথিত অন্ধকূপে ১৪৬ জন ইউরোপীয় বন্দিকে একত্রে রাখা হয়নি। সুতরাং, এটা সত্য নয়। 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের লেখক পার্সিভাল স্পিয়ারও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে হলওয়েলের দাবি সমর্থন করেননি।

-আচ্ছা বুঝতে পারলাম। তাহলে কলকাতার পতনের পর ইংরেজরা কী করলো?

-নওয়াবের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই সন্ধি অনুসারে নওয়াব ইংরেজ পক্ষকে কলাকাতার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হন। কিন্তু ইংরেজরা শান্তিচুক্তির আড়ালে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে।

-কীভাবে তাঁরা যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে?

-সিরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে তারা এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকে, যিনি তাদের প্রতি পুরোপুরি বন্ধুত্বপরায়ণ হবে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা মীর জাফর, জগৎশেঠ ও অন্যান্য ক্ষুব্ধ

https://nagorikpathagar.org

অভিজাতদের সাথে যোগাযোগ করে সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষে টানতে সমর্থ হয়।

-মীর জাফর তো সিরাজের সেনাপতি ছিল।

-হ্যাঁ। তাহলে বোঝো, সেনাপতি যদি শত্রুপক্ষে চলে যায়, রাজার আর কিছু করার থাকে? সব ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হওয়ার পর কোম্পানিপ্রধান ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধীনে কোম্পানির সৈন্যরা মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন নওয়াব পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের মুখোমুখি হন। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে চুপচাপ কিছু না করিয়ে পুতুলের মতো দাঁড় করিয়ে রাখেন। অন্য দুজন সেনাপতি মীর মদন ও মোহনলাল অল্পকিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করলেও নওয়াব পরাজিত হন এবং পালিয়ে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন। মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই নওয়াব বন্দি অবস্থায় নিহত হন। ইতোমধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর জাফরকে বাঙলার নতুন নওয়াব মনোনীত করে।

তাহলে বুঝতে পারছো, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়েছিল যতটা না তাদের সামরিক শক্তির কারণে, তার চেয়ে বেশি ষড়যন্ত্রের শক্তিতে এবং সিরাজউদ্দৌলার সেনাছাউনির অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতায় নওয়াবের পরাজয়ে বাঙলা ইংরেজদের পদানত হয়। এরপর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদিও এ গল্প আমি আগে শুনেছি। তবু বাবার মুখে শুনে আরো খারাপ লাগতে লাগলো। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন–

সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার। আর ব্রিটিশরা ছিল

https://nagorikpathagar.org

এ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী ও ইন্ধনদাতা।

-আমি যে শুনেছি সিরাজ কিছুটা উদ্ধত ছিলেন?

-এটি সম্ভবত সত্যি যে, নওয়াব হিসেবে সিরাজ ছিলেন খানিকটা উদ্ধত এবং খুব সম্ভবত কিছুটা অসহিষ্ণু। অস্থিরচিত্তের সিরাজের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব ছিল। এছাড়া সংকটকালে সিদ্ধান্তহীনতাও তাঁর অন্যতম ত্রুটি। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সিরাজ তখন ছিলেন অল্প বয়সের এক অপরিণত যুবক। ক্ষমতা ও উচ্চাসন হয়তো তাঁকে কিছুটা বেপরোয়াও করে তুলেছিল।

-নবাব হিসেবে সিরাজ তো ঠিক কাজই করেছিলেন। তাই না?

-না, নবাব হিসেবে তিনি কৌশলী ছিলেন না। সিরাজউদ্দৌলার সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল, অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি তাঁর সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে একই সাথে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। তারা যাতে সংঘবদ্ধ হতে না পারে, তেমন কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। সব শত্রুকে একসাথে মোকাবিলা করতে নেই। শত্রুদের মধ্যে যেন ঐক্য না হয়, সেটা খেয়াল রাখা কৌশলী রাজাদের কাজ। আগে তোমাকে আরেকটা কৌশলের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

-কৌশলগত পশ্চাদপসরণ?

-একদম ঠিক। এর সাথে দরকার শত্রুদের ঐক্য যেন না হয়, তা খেয়াল করা।

-কিন্তু সিরাজের পরিবারের কী হয়েছিল? আমি জানতে চাই।

-সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা এবং তাঁর শিশুকন্যাকে মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে ঢাকায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

-ঢাকা! মানে আমাদের ঢাকায়?

-হ্যাঁ। ঢাকার জিঞ্জিরায় একটা প্রাসাদ ছিল। সেখানে তারা সিরাজের মা আমেনা বেগম, খালা ঘসেটি বেগম, সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেছা ও তার শিশুকন্যাসহ সবাইকে বন্দি করে রাখে।

-তুমি যে বললে, ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ছিল। তাহলে তাঁকে কেন বন্দি করবে ইংরেজরা? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

-সিরাজের পতনের আগ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ঘসেটি বেগমকে ব্যবহার করলেও সিরাজের পতনের পর আর তাকে কোনো পাত্তা দেয়নি। কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা প্রাসাদে তারা বেশ কিছুদিন বন্দি জীবনযাপন করার পর মীরনের নির্দেশে ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগমকে নৌকায় করে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়।

-সর্বনাশ! এটা তো ভয়ংকর কথা? কোন নদীতে?

-হতে পারে আমাদের বুড়িগঙ্গা বা শীতলক্ষ্যা। আর খেয়াল করে দেখো, ঘসেটি বেগম ইংরেজদের তাঁবেদারী করেও বাঁচতে পারলো না। নিহত হলো তাদেরই উত্তরসূরীর হাতে নির্মমভাবে।

-আর সিরাজের স্ত্রী-কন্যার কী হয়েছিল?

-সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেছা এবং তাঁর শিশুকন্যাকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত সামান্য বৃত্তির ওপর নির্ভর করে তাঁদেরকে জীবনধারণ করতে হয়। সিরাজের মৃত্যুর দীর্ঘ ৩৪ বছর পর লুৎফুন্নেছা ইংরেজি ১৭৯০ সালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার উপরে ইংরেজদের লোভের কারণ

ইংরেজরা সিরাজের পতনের পর কী করলো? বাঙলার উপর তাদের এত লোভেরই- বা কারণ কী? আমি

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে মীর জাফর তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে বাঙলার সিংহাসনে বসে। প্রতিদান হিসেবে মীর জাফর বর্তমান ২৪ পরগণা এলাকা ব্রিটিশদের দান করে। সাথে উপঢৌকন হিসেবে প্রচুর ধনরত্নও দেওয়া হয়। রাজকোষ শূন্য হয়ে মীর জাফরের আর্থিক ক্ষমতা কমে এলে ব্রিটিশরা তার জামাই মীর কাশিমকে বাঙলার মসনদে বসায়। প্রতিদান হিসেবে তিনি ব্রিটিশদের মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং চট্টগ্রাম এলাকা দান করেন। ব্রিটিশদের চাপ মীর কাশিমের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় মীর কাশিম তার রাজধানী সরিয়ে মুঙ্গেরে নিয়ে যান এবং ব্রিটিশদের দেওয়া সমস্ত বাণিজ্যিক অধিকার বন্ধ করে দেন।

– মীর কাশিম তো তাহলে সিরাজের মতোই কাজ করলো!

https://nagorikpathagar.org

– হ্যাঁ, ঠিক তাই।

– তারপর?

– ব্রিটিশরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পাটনা অধিকার করে। মীর কাশিম পাটনা পুনরায় অধিকার করলেও পরে কয়েকটা যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় হয়। মীর কাশিম পালিয়ে গিয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নেন। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অযোধ্যার বক্সার নামক স্থানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাঙলার নবাব মীর কাশিম এবং মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়ী হয়। ফলে বাঙলাদেশে যেটুকু নবাবী শাসন ছিল তার অবসান হয় এবং ইংরেজ কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে শুরু হয়ে যায়।

– তাহলে সিরাজের পরাজয়ে পুরো বাঙলা ইংরেজদের দখলে চলে যায়নি?

– না যায়নি, একটা অংশ গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধে পুরোটা চলে যায়।

– একটা প্রশ্নের জবাব পেলাম। কিন্তু ইংরেজদের বাঙলার উপরে এত লোভ কেন ছিল?

– ইংরেজদের বাঙলার তুলার উপরে লোভ ছিল। বাঙলায় উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হতো। সেই তুলা থেকেই তৈরী হতো মসলিন। এই মসলিন আরব বণিকেরা ইউরোপে নিয়ে যেতো।

– শুধু তুলার জন্য দেশ দখল? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– হুঁ, সেটা একটা কারণ। তুলা সেই সময় একটা খুব দামী পণ্য ছিল। আরেকটা কারণ ছিল। সেটা হচ্ছে, সেই সময়

https://nagorikpathagar.org

ইউরোপে একটা কাপড় পরা হতো, সেটাই হচ্ছে সেই লিনেন যার থেকে আমরা এই গল্প শুরু করেছিলাম। এই লিনেন তৈরী হয় তিসি গাছ থেকে। ইউরোপে লিনেনের সাপ্লাই আসতো বলকান অঞ্চল থেকে।

– বলকান অঞ্চল কোনটা?

– রোমানিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস, ক্রোয়েশিয়া এই অঞ্চলটাকে বলকান এলাকা বলা হয়।

সেই সময়ে বলকানে একটা যুদ্ধ হওয়ায় ইউরোপে লিনেনের সাপ্লাইয়ের ঘাটতি পড়ে। তাই ইংরেজরা লিনেনের একটা বিকল্প খুঁজতে থাকে। বাঙলায় তারা পায় পাট। ইংরেজরা আসার আগে শস্য হিসেবে পাটের চাষ হতো না জমিতে। ইংরেজরা পাট থেকে লিনেনের মতো একটা কাপড় বানানোর চেষ্টা করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল, কাছাকাছি একধরনের কাপড় তারা তৈরী করতে পারবে পাট থেকে।

– ওরা কি পাট থেকে সেই ধরনের কাপড় বানাতে পেরেছিল?

– না, তারা তখন পারেনি, কিন্তু এখন হয়।

https://nagorikpathagar.org

ঢাকার গৌরব মসলিন

তবে মসলিনের এত সুনাম কেন? ইংরেজরা মসলিন ব্যবহার করতো না? আমি বলি।

– মসলিন ছিল বাঙলার একটা সম্পদ। এই মসলিন তৈরী হতো অনেক আগে থেকেই। ব্রিটিশরা যখন আসে তখন যে-মসলিন বিখ্যাত ছিল সেটা ঢাকাই মসলিন। ঢাকা শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় কারিগরেরা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সুতা থেকে এই মসলিন তৈরী করতো।

বাঙলার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। একসময় বাঙলার সুতিবস্ত্র রোম ও চীন সাম্রাজ্যে রপ্তানী করা হতো। এর উল্লেখ রয়েছে টলেমির ভূগোলে, *Periplus of the Erythraean Sea* গ্রন্থে এবং প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনায়।

– Periplus of the Erythraean Seaটা কী?

– এটা মূলত গ্রীক ভাষায় লেখা নাবিক বিবরণী। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। এখানে কী লেখা ছিল তোমাকে শোনাই। "অতঃপর পথ পুনরায় পূর্ব দিকে বাঁক নেয়, এবং

https://nagorikpathagar.org

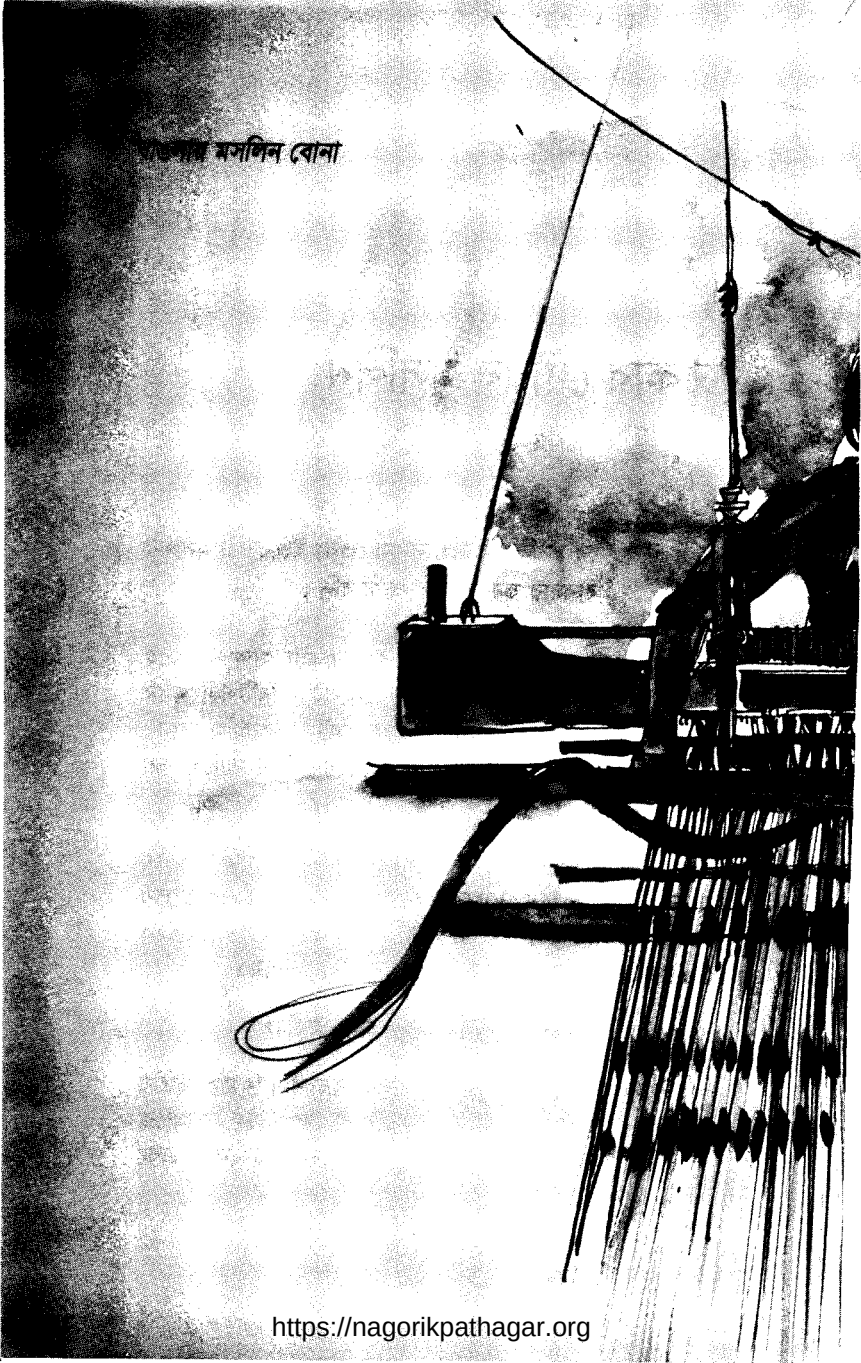

ঢাকায় মসলিন বোনা

https://nagorikpathagar.org

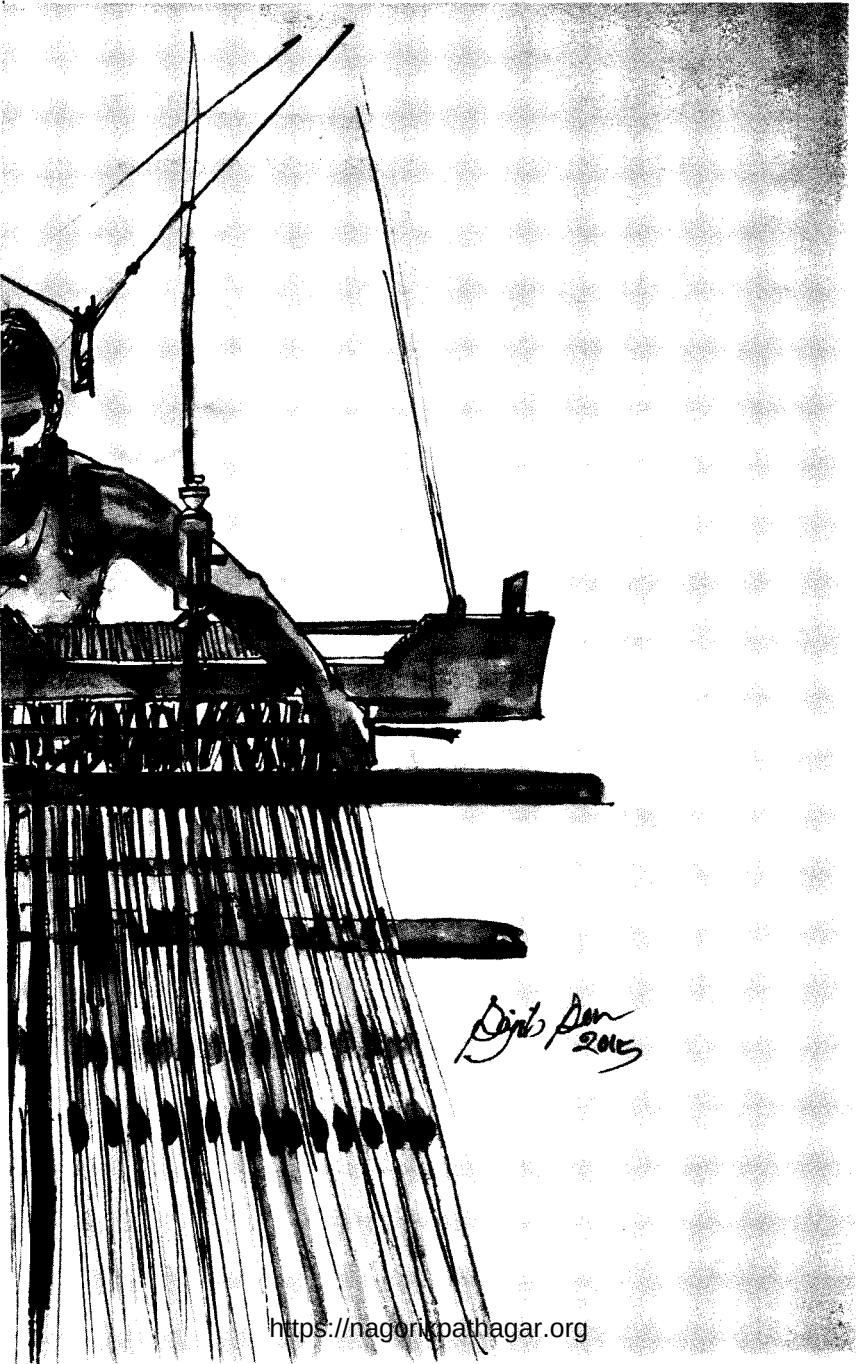

https://nagorikpathagar.org

ডাইনে মুক্ত সমুদ্র এবং বাঁয়ে দূরে উপকূল রেখে জাহাজ চালালে পরে গঙ্গা দেখা যাবে, এবং তার কাছেই পূর্ব দিকের সর্বশেষ দেশ সুবর্ণভূমি। এর নিকটে এক নদী আছে, নাম গঙ্গা। এই নদীর উৎপত্তি ও বিলয় ঠিক নীল নদেরই মতো। এই নদীর তীরে এক হাটপত্তন আছে, তার নাম ও নদীর নাম একই, গঙ্গা। এইখান দিয়ে আসে তেজপাতা, গাঙ্গেয় সুগন্ধি অঞ্জন তেল ও মুক্তা এবং সর্বাধিক উৎকৃষ্ট মসলিন যা বলা হয় গাঙ্গেয়। শোনা যায় যে এইসব স্থানের নিকটে সোনার খনি আছে, এবং একরকম সোনার মোহর চলে যাকে বলে কলতিস।"

– তার মানে? বাঙলায় সোনার খনি ছিল? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– খ্রিষ্টীয় দুই শতকে যদি সোনা দিয়ে মুদ্রা করা হয় তবে সেই সোনার উৎপাদন দেশে হওয়ার কথা। বাইরে থেকে সোনা আমদানী করে মুদ্রা বানিয়ে চালানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ সেই সময়ে। এছাড়াও বাঙলায় সুবর্ণবণিক বলে একটা সম্প্রদায় ছিল, যারা সোনা কেনাবেচা করতো। প্রাচীন বাঙলার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ, মানে সোনা ছিল। সোনার বাঙলা যেই শব্দগুচ্ছ আমরা ব্যবহার করি সেটার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা অসম্ভব নয়।

– তাহলে সেই সোনার খনি কোথায় গেল?

– হয়তো সেই খনিতে সোনার পরিমাণ অত বেশী ছিল না। আর বাঙলায় এত বেশী লুণ্ঠন করতো বিদেশীরা যে সেই সোনা পুরোটাই লুট হয়ে যেতে পারে।

মুঘল আমলে বাঙলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি বেড়ে যায় এবং তা দূর-দূরান্তের

https://nagorikpathagar.org

বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। মুঘল সম্রাট ও অভিজাতরা ঢাকার মসলিন শিল্পের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পদস্থ কর্মকর্তা ও অভিজাতদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উৎপাদন কেন্দ্র বা আড় থেকে কাপড় সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠাতো। আড় থেকে আড়ং শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

– আড়ং শব্দটা তাহলে এখান থেকেই এসেছে?

– হ্যাঁ। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে যে এক ধরনের মেলা হয় সেটাকে আড়ং বলে। ঢাকায় যে আড়ং-এর দোকান দেখা যায় সেটা এখান থেকেই এসেছে। সেখানে বিদেশী ক্রেতারা সেগুলো কেনার জন্য নগদ অর্থ নিয়ে তৈরী থাকতো। এসব বিদেশী ক্রেতা আসতো বিভিন্ন দেশ থেকে – পশ্চিমের আরব, ইরান, আর্মেনিয়া এবং প্রাচ্যের চীন, মালয়েশিয়া ও জাভা থেকে।

ইংরেজদের ক্ষমতা দখলেরও অনেক পরে ১৮৫১ সালে লন্ডনে এক প্রদর্শনী হয়। সেই বিশাল প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিন দেখানো হয়। যদিও আগে থেকেই ইউরোপ মসলিন কী জানতো তবে আধুনিক ইউরোপে মসলিন নিয়ে নতুন আগ্রহ শুরু হয়। মসলিনের খ্যাতি নতুন করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের উৎকর্ষ ও সূক্ষ্মতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

– প্রদর্শনী কেন করে?

– অনেক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ

https://nagorikpathagar.org

বাণিজ্যিক। যেই পণ্যটার প্রদর্শনী হয় সেই পণ্যটা সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী করতে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশে যে রপ্তানী মেলা হয় সেটাও কিন্তু এই ধরনের প্রদর্শনী।

– মসলিনের জন্য কি বিশেষ কোনো তুলা ছিল?

– হ্যাঁ। ব্রহ্মপুত্রের তীরে কোনো কোনো এলাকায় ফুটি নামে এক ধরনের তুলা জন্মাতো। এর সুতা থেকে তৈরী হতো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র। মসলিন কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা, উৎপাদনের উৎস এবং ব্যবহারভেদে মসলিনের বিভিন্ন নাম দেওয়া হতো।

– তাই? কী নামে ডাকা হতো সেই মসলিনগুলোকে?

– নামগুলো ছিল মলমল (সূক্ষ্মতম বস্ত্র), ঝুনা (স্থানীয় নর্তকীদের ব্যবহৃত বস্ত্র), রঙ্গ (স্বচ্ছ ও জালিজাতীয় বস্ত্র), আবি-রাওয়ান (প্রবহমান পানির তুল্য বস্ত্র), খাস (বিশেষ ধরনের মিহি বা জমকালো), শবনম (ভোরের শিশির), আলাবালি (অতিমিহি), তনজিব (দেহের অলঙ্কার সদৃশ), নয়ন-সুখ (দর্শন প্রীতিকর), বদন-খাস (বিশেষ ধরনের বস্ত্র), শিরবন্দ (পাগড়ির উপযোগী), কামিজ (জামার কাপড়), ডোরিয়া (ডোরা কাটা), চারকোনা (ছক কাটা বস্ত্র), জামদানি (নকশা আঁকা) ইত্যাদি।

সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিনের নাম ছিল মলমল। বিদেশী পর্যটকেরা এই মসলিনকে কখনও কখনও মলমল, শাহী বা মলমল খাস নামে উল্লেখ করেছেন। এগুলো বেশ দামী এবং এরকম এক প্রস্থ বস্ত্র তৈরী করতে তাঁতীদের দীর্ঘদিন, এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতো। এই বস্ত্র সম্রাট ও নওয়াবরাই ব্যবহার করতেন। সম্রাটদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম ছিল মলবুস খাস এবং নওয়াবদের জন্য সংগৃহীত বস্ত্রের নাম

https://nagorikpathagar.org

ছিল সরকার-ই-আলা। লতা মুঙ্গেশকরের একটা গান আছে শুনেছ?– "হাওয়া মেঁ ওরতা যায়ে মোরা লাল দোপাট্টা মলমল কা হো জি, ইধার উধার লেহরায়ে মোরা লাল দোপাট্টা মলমল কা হো জি।"

– হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি, বাকের ভাইয়ের প্রিয় গান। বলেই আমি হেসে দিই।

– হ্যাঁ, এটাই সেই ঢাকাই মলমল। বাবাও হেসে বলে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামেই তাঁতশিল্প ছিল। তবে কয়েকটি স্থান ছিল উৎকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধ। এগুলো হচ্ছে : ঢাকা শহর ও ধামরাই, গাজীপুর জেলার তিতাবদি, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর।

পলাশীর যুদ্ধের পর ঢাকার মসলিন শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মসলিন রপ্তানীর পরিমাণ অর্ধেকে নেমে আসে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার মসলিন উৎপাদন হ্রাস পেয়ে নগণ্য পরিমাণে এসে দাঁড়ায়।

– তাহলে এ সময়ই লন্ডনে মসলিনের প্রদর্শনী হলো কেন?

– অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন ইউরোপকে দেখানো কী সম্পদ ভারতবর্ষে আছে। আর এই কাপড় ইউরোপে আনলে বিক্রি কেমন হবে সেটা দেখাও একটা কারণ হতে পারে।

– কেন এভাবে হঠাৎ করে মসলিন ধ্বংস হয়ে গেল?

https://nagorikpathagar.org

– তুমি দেখেছো, মসলিন ছিল রপ্তানীযোগ্য পণ্য, সাধারণ মানুষের জন্য নয়– রাজা-বাদশাহদের জন্য। মুঘল বাদশাহ, নওয়াব ও পদস্থ কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবই ঢাকাই মসলিন শিল্পের অবনতির প্রথম কারণ। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলার ব্যবসাক্ষেত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের ফলে ইউরোপের অন্যান্য কোম্পানী এবং বিভিন্ন দেশের বণিকদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তবে মসলিন শিল্পের অবনতি ও চূড়ান্ত বিলুপ্তির প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। এভাবে ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত সস্তা দামের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় ঢাকার মসলিনের মতো দামী সুতিবস্ত্র। এছাড়াও ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতিও মসলিন ধ্বংসের জন্য দায়ী।

– বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতি আবার কী? এটা বেশ কঠিন লাগছে যে।

– ব্রিটিশরা স্থানীয়ভাবে তৈরী করা বস্ত্রের উপরে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কর আরোপ করে, যেখানে ব্রিটেনে তৈরী করা আমদানীকৃত কাপড়ের উপরে মাত্র ২ থেকে ৪ শতাংশ কর ছিল। এর ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়ের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। দামের কারণে দেশী মসলিনের ক্রেতা থাকে না। এবং তাঁতশিল্পে ধস নামে। জনশ্রুতি আছে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা মসলিন উৎপাদন বন্ধ করার জন্য মসলিন বয়নকারী তাঁতীদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নেয়।

– এই কথা কি সত্যি? আমি জানতে চাই।

https://nagorikpathagar.org

– ইতিহাসের কোনো বইয়ে এমন ধরনের ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য আমরা পাই না। তাই বলতে হবে এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার জন্য এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। তবে জনশ্রুতি অনুসন্ধান করলে অনেক সময় সত্য উদঘাটিত হয়। এভাবেই বিষয়টাকে ধরে নিতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

আমরা কোথায় ছিলাম গল্পের? আমি প্রশ্ন করি।

– আমরা ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের গল্প শেষ করেছিলাম।

– তাহলে সেখান থেকে শুরু করো।

এরপর তো শুধু বিদ্রোহ আর হত্যার গল্প বলতে হবে। ইংরেজ শাসনে যত বাঙালী গণহত্যার শিকার হয়েছে, সারা পৃথিবীতে তত মানুষ ব্রিটিশ উপনিবেশে মারা যায়নি। পলাশীর পরাজয়ের মাত্র ১৩ বছরের মাথায় ১৭৭০ সালে এই ভূখণ্ডের ইতিহাসে প্রথম মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষে ১ কোটি মানুষ মারা যায়, যা সেই সময়ের বাঙালী জনগোষ্ঠীর তিন ভাগের একভাগ ছিল। পৃথিবীতে গণহত্যার শিকার হওয়া কোনো জনগোষ্ঠী, যে তার এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে হারিয়েছে, সেই জনগোষ্ঠী আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে এমন উদাহরণ নাই। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ৫০-৭৫ লক্ষ বাঙালীকে গণহত্যার শিকার হতে হয়েছে।

১৭৬৪ সালের পর থেকে ইংরেজদের শোষণের মাত্রা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ফলে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (বাঙলা ১১৭৬ সালে) বাঙলা ও বিহারে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। ইংরেজ-সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ মহাদুর্ভিক্ষে

https://nagorikpathagar.org

রূপ নেয়। এটাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় তাদের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, কোথাও কোথাও জীবিত মানুষ মৃত মানুষের মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। নদীর তীর মৃত ও মুমূর্ষু মানুষের ভাগাড়ে পরিণত হয়।

– কেন এই দুর্ভিক্ষ হলো?

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এই অঞ্চলে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চালু হয়। নবাবের হাতে থাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব, আর রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব পায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এতে বাঙলার নবাব আসলে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে আর এই সুযোগে কোম্পানীর লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে। তার উপর ১৭৭০ সালে (বাঙলা ১১৭৬) অনাবৃষ্টি হয়। দেশে দেখা দেয় চরম বিপর্যয় ও ইতিহাসের নির্মমতম দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে বহু গবেষণা আছে। সেসব গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি খাদ্য উৎপাদন কম হওয়ার কারণে এই দুর্ভিক্ষ ঘটেনি, ঘটেছিল ইংরেজ কোম্পানীর লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কারণে। ভেবে দেখো, তিন কোটি বাঙালীর এক কোটিকেই হত্যা করা হয়!

– এই ভয়ানক কাজটা কেন করে ইংরেজরা?

– বড় হলে জানতে পারবে, কোনো জাতিকে পদানত করতে হলে এক জাতি আর এক জাতির উপরে হয় গণহত্যা চালায় অথবা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে না খাইয়ে মারে। এভাবেই আর এক জাতির লোকসংখ্যাকে কমিয়ে দেওয়া হয়। বাবা বলে।

– আমি বড়দের এই ভয়ানক শয়তানিতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলায় গণবিদ্রোহের শুরু

কী বীভৎস! আমি বলি। বাবা নীরব থাকেন। আমি তাকে গল্পে ফিরিয়ে আনতে বলি, কিন্তু এর ফলে কোনো বিদ্রোহ হলো না?

বাবা গল্পে আবার ফিরে আসে। বাঙলায় ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা থেকেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ভারতে ইংরেজ বেনিয়ার শাসনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষকসমাজ। স্থান বিচারে বাঙলা, তারপর বিহারসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল। আবার ঐতিহাসিক সত্য হলো, প্রথম সাহসী প্রতিবাদ ও বিদ্রোহগুলোও হয় বাঙলায়। আর এসব প্রতিবাদ-বিদ্রোহ সংঘটনের কেন্দ্রে ছিল বাঙলার কৃষককুল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে কোম্পানীর প্রবর্তন করা ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারদের অত্যাচার, প্রচলিত বাঙালী সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন নতুন আইন ও বিচারব্যবস্থায় বাঙলার কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা তাদের ব্রিটিশবিরোধী করে তুলেছিল। দরিদ্র ভূমিহীন প্রজাদের বিদ্রোহ তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

https://nagorikpathagar.org

এই বিদ্রোহের পিছনে আরেকটা কারণ ছিল ইংরেজদের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এটা হচ্ছে একধরনের জমিদারী প্রথা, যেখানে ধনীরা টাকা দিয়ে ইংরেজদের কাছে থেকে জমিদারী কিনতো। সেই জমিদারীতে ভূমিরাজস্বের হার ছিল খুবই বেশী।

– ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কী?

– ভূমির মালিকানা এবং খাজনা দেওয়া ও নির্ধারণের পদ্ধতি।

– বাঙলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় কোন ধরনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল?

– রাজস্ব আদায় আগে হতো গ্রামসমাজ থেকে ফসল দিয়ে, মুদ্রা দিয়ে নয় বা কোনো ব্যক্তির কাছে থেকে নয়। ইংরেজরাই প্রথম ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রচলন করাসহ রাজস্ব হিসেবে ফসলের বদলে মুদ্রাপ্রথা প্রচলন করে। ফলে গ্রামীণ সমাজের যৌথ অংশীদারিত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

এইসব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ে। ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের শিল্পবিপ্লবের ফলে ভারতীয় কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল কৃষকেরা তাই ব্রিটিশবিরোধী হয়ে ওঠে।

– চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়টা আমি আরো জানতে চাই।

– ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রশাসন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার ও বাঙলার জমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই চুক্তির আওতায়

https://nagorikpathagar.org

জমিদারেরা ভূ-সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিকে পরিণত হয়। এর ফলে জমিদারেরা নির্ধারিত হারে কোম্পানীকে রাজস্ব দিয়ে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারী স্বত্ব লাভ করে।

– এটা কেন করা হয়?

– জমিদারদের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের কিছু উদ্দেশ্য ছিল। এগুলো হচ্ছে : রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা; ইংরেজ সরকার যাতে সবসময় একটি ন্যূনতম রাজস্ব পেতে পারে তা নিশ্চিত করা; রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় থেকে কর্মকর্তাদেরকে দায়মুক্ত করে তাদেরকে প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা; এবং জমিদার শ্রেণী ও ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা। এবং একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে থাকবে।

– তাহলে মধ্যবিত্তরা ইংরেজদের সৃষ্টি?

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাদের চিন্তাকাঠামোও ইংরেজদের তৈরী করে দেওয়া। এরা ইউরোপীয়দের মতোই ভাবে।

– এটা তো ভালো কথা তাহলে।

– মোটেই না। বাঙলা তো ইউরোপ নয়। বাঙলার ইতিহাসও ইউরোপের ইতিহাস নয়। আজকের ইউরোপ যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করে ইউরোপ হয়েছে সেই ইতিহাসের কণ্টকময় দীর্ঘ পথে সে যাত্রা না করেই তার সব ফল উপভোগ করতে চাইলে সে কোনো ফল পাবে না। সে কারণেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ইউরোপের মতো শুধু চিন্তা করতে পারে; স্বপ্নে, কল্পনায় সে ইউরোপের সাথে পাল্লা দিতে পারে না।

– কেন পারে না?

https://nagorikpathagar.org

– একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আরেক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। ইউরোপের চিন্তার পোশাকটা ধার করে সমাজ পরিবর্তন করতে চাইলে লাভ নেই। বাঙলার সমাজ পরিবর্তনের পথ বাঙলার জমিতে দাঁড়িয়েই করতে হবে।

– তোমার কথাগুলো খুব কঠিন লাগছে।

– বড় হলে বুঝতে পারবে পুরোপুরি। তবে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক বড় ক্ষতি করে দিয়ে গেছে বাঙলায়।

– কী সেটা?

– সেটা হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদার শ্রেণী হয় মূলত হিন্দুরা আর কৃষকেরা হয় মুসলমান। এই শোষণ ভিত্তিক জমিদারী প্রথায় শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্ব বাঙলায় মূলত হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে হাজির হয়। এখান থেকেই শুরু এই ভূখণ্ডের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ইতিহাস।

কিন্তু এতসব কৌশল করেও ইংরেজরা শান্তিতে থাকতে পারেনি। বাঙলার মানুষ বিদ্রোহ শুরু করে।

https://nagorikpathagar.org

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

এবার তাহলে বিদ্রোহের গল্প? আমি বলি।

– হ্যাঁ, তাই। বাঙলায় কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন ফকির ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। এঁরা পেশায় মূলত ছিল কৃষক। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর বাঙলা ও বিহারের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যাপ্তি।

– ফকির-সন্ন্যাসীরা কেন বিদ্রোহ করে তাদের দাবী কী ছিল?

– বছরের বিশেষ সময়ে ফকির-সন্ন্যাসী কৃষকেরা তীর্থে যেত। তীর্থে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাউকে কখনো কর দিতে হতো না। কিন্তু ইংরেজরা তাদের উপর তীর্থকর বসায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ইংরেজদের পৈশাচিক শোষণ ও অত্যাচারের দৃশ্য দেখে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজ, মহাজন ও কিছু জমিদারের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। পাশাপাশি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের নামে জুলুম, জমি থেকে ইচ্ছামতো কৃষক উচ্ছেদ, প্রভৃতি কারণে বাঙলা-বিহারের কৃষকের ক্ষোভ

https://nagorikpathagar.org

আরও বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব আদায়ের নামে লুণ্ঠন ও কোম্পানীর লোকদের নির্দয় অত্যাচারে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এছাড়া ফকির-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই রেশম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা নানাভাবে তাদের এই ব্যবসাতে বাধা দিতো।

– ফকির আর সন্ন্যাসী মিলে কতজন মানুষ হবে? খুব বেশী কি?

– তোমার ধারণা ভুল। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এই বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের 'মাদারি' সম্প্রদায়ের ফকির এবং পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহের 'গিরি', 'গোঁসাই' এবং 'নাগা' সন্ন্যাসীরা প্রথম এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। পরে ক্ষমতাচ্যুত জমিদার, ছাঁটাই হওয়া সৈনিক ও বিতাড়িত কৃষক এ বিদ্রোহে যোগ দেয়। ফলে এই বিদ্রোহ শুধু ফকির আর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল না। এটা একটা গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। তুমি আগেও জেনেছো, এই ফকির সম্প্রদায়ই পূর্ববঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরুর নেতৃত্ব দেয়। তাই তাঁদের সাথে বাঙলার কৃষকের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ, মুশা শাহ, মজনু শাহ, পরাগল শাহ, চিরাগ আলী শাহ প্রমুখ অন্যতম। এদের মধ্যে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয় ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে।

– বিদ্রোহীরা কী করে বিদ্রোহ শুরু করে?

– বিদ্রোহীরা প্রথমে কোম্পানীর কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও মহাজনদের বাড়ী আক্রমণ করে। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় সর্বপ্রথম ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়। ক্রমে তা দাবানলের মতো মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, ময়মনসিংহ,

https://nagorikpathagar.org

বগুড়া, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কোম্পানীর কাজ চালানো, খাজনা সংগ্রহকে বাধা দেওয়া, কোম্পানীর সম্পদ লুঠ করাই ছিল বিদ্রোহীদের কাজ। ফকির মজনু শাহ বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে লড়াই চালান

– এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত কীভাবে শেষ হয়?

সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নেতাদের অভিজ্ঞতার অভাব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা, সঠিক পরিকল্পনার অভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, আদর্শহীনতা এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব প্রভৃতি কারণে চার দশক ধরে চলতে থাকা এই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

https://nagorikpathagar.org

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ : "জাগো বাহে, কোনঠে সবায়"

এবার কোন বিদ্রোহের কথা? আমি বলি।

বাবা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে, "জাগো বাহে, কোনঠে সবায়!"

– এটা আবার কী? আমি চমকে উঠে বলি।

এটা উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ নূরলদীনের ডাক। এবার আমরা রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের গল্প বলবো। ইংরেজ শাসনকালে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম হলো রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), যার নায়ক কৃষক নূরলদীন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়কালেই বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ রংপুরে সংঘটিত হয় অন্য ধরনের এক কৃষক বিদ্রোহ, ইতিহাসে যা 'রংপুর বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এতে ইংরেজ ও এদেশীয় শোষকদের প্রতিনিধি ছিলেন দেবী সিংহ। অন্যদিকে ছিলেন নিপীড়িত, কৃষক সমাজের নেতা বিপ্লবী নূরলদীন।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' বইয়ে রংপুর বিদ্রোহের বিবরণ রয়েছে

https://nagorikpathagar.org

এভাবে : "যখন চাষীদের উপর এই কর বৃদ্ধি ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল, যখন তাহারা বন্য পশুর মতো দলে দলে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, চক্ষুর সম্মুখে নিজেদের কুঠার ও যথাসর্বস্ব অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। কাজেই এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উত্তরবঙ্গের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করিল।"

রংপুর বিদ্রোহ প্রকাশ্য রূপ নেয় ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সুপ্রকাশ রায় *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* বইয়ে লিখেছেন, "কৃষকগণ ইংরেজ অনুচর দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাহাদের দাবী সম্বন্ধে একখানি আবেদনপত্র পেশ করিয়া এই দাবী পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কালেক্টর দাবী পূরণের জন্য কোনো চেষ্টাই করিলেন না, ইহার পর কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা কালেক্টরকে জানাইয়া দিলো, তাহারা আর খাজনা দিবে না এবং এই শাসন মানিয়া চলিতেও প্রস্তুত নহে।"

বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য তখন কৃষকেরা নিজেদের মধ্য থেকে নূরলদীনকে নেতা নির্বাচন করে। শুধু নেতা নির্বাচন নয়, কৃষকেরা তাঁকে নবাব বলেও ঘোষণা দেয়।

কৃষক বিপ্লবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দায়িত্ব নেন এবং দয়াশীল নামের একজন প্রবীণ কৃষককে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। নূরলদীন দেবী সিংহকে কর না দেওয়ার আদেশ দেন। বিদ্রোহের ব্যয় পরিচালনার জন্য 'ডিংখরচা' নামে চাঁদা আদায় করেন। এভাবে রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহারসহ উত্তরাঞ্চলের

https://nagorikpathagar.org

প্রায় সব কৃষক নূরলদীনের নেতৃত্বে দেবী সিংহের বর্বর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ ও এই অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রস্তুত হয়।

১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতেই বিদ্রোহী কৃষকেরা রংপুর থেকে দেবী সিংহের কর সংগ্রহকারীদের বিতাড়িত করে, অনেক কর্মচারী খুনও হয়। টেপা, ফতেপুর ও বাকলায় বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। টেপা জমিদারীর নায়েব, ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহী কৃষকদের বাধা দিতে এসে নিহত হন। বিদ্রোহীদের সাফল্যে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে, বিশেষ করে দিনাজপুর, কুচবিহারের কৃষকেরাও 'নবাব' নূরুলদীনের বাহিনীতে যোগ দেয়।

বিদ্রোহ যখন তুমুল, তখন রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড দেবী সিংহকে রক্ষায় ও কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য কয়েক দল সিপাহী পাঠায়, যার নেতৃত্বে ছিল লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড। বিদ্রোহ দমনে তারা বর্বর আক্রমণ চালায়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং মানুষ দেখামাত্রই পশুর মতো গুলি করে। এর প্রতিশোধে দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান ঘাঁটি মুঘলহাটে বন্দরের উপর কৃষকেরা মরণপণ আক্রমণ করে এবং সেখানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহের নায়ক 'নবাব' নূরলদীন গুরুতর আহত হয়ে শত্রুদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়াশীল নিহত হন। নির্মম অত্যাচার করে ইংরেজরা নূরলদীনকে হত্যা করে।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যে মাটির নবাবের সংলাপে সেখানে দেখা যায় মাটির মানুষের চিরন্তন চাওয়া, কৃষি ও কৃষকের নিরাভরণ আকাঙ্ক্ষা :

> পুন্নিমার চান নয়, অনাহারী মানুষেরা চায়
> ধানের সুঘ্রাণে য্যান বুক ভরি যায়,

https://nagorikpathagar.org

পুন্নিমার মতো হয় সন্তানের মুখ রোশনাই।
ইয়ার অধিক মুঁই কিছু চাঁও নাই।

...এক এ নূরলদীন যদি চলি যায়,
হাজার নূরলদীন আসিবে বাঙলায়।
...এ দ্যাশে হামার বাড়ী উত্তরে না আছে হিমালয়
উয়ার মতন খাড়া হয় য্যান মানুষেরা হয়।
এ দ্যাশে হামার বাড়ী দক্ষিণেতে বঙ্গোপসাগর,
উয়ার মতন গর্জি ওঠে য্যান মানুষের স্বর।
এ দ্যাশে হামার বাড়ী পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র আছে,
উয়ার মতন ফির মানুষের রক্ত য্যান নাচে।
এ দ্যাশে হামার বাড়ী পশ্চিমেতে পাহাড়িয়া মাটি,
উয়ার মতন শক্ত হয় য্যান মানুষের ঘাঁটি।

বাবার আবৃত্তি শুনতে শুনতে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই।

https://nagorikpathagar.org

ওয়াহাবী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ ও তাঁর কেল্লা

এরপর কোন বিদ্রোহের গল্প? আমি বলি।

এরপর ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের চেয়েও আরও একটু সংগঠিত বিদ্রোহ ও আন্দোলনের কথা। এটা হচ্ছে ওয়াহাবী আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহের কথা।

'ওয়াহাবী' শব্দের অর্থ হলো 'ওয়াহহাবের মতাদর্শিক অনুসারী'। আরব দেশে ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ওয়াহাবী আন্দোলন মূলত ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও অচিরেই তা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর-প্রদেশের রায়বেরিলির অধিবাসী শাহ সৈয়দ আহমদ। তিনি বলেন, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ 'দার-উল-হার্ব' বা বিধর্মীর দেশে পরিণত হয়েছে, একে 'দার-উল-ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের দেশে পরিণত করতে হবে। সুতরাং এই আন্দোলনের রাজনৈতিক

https://nagorikpathagar.org

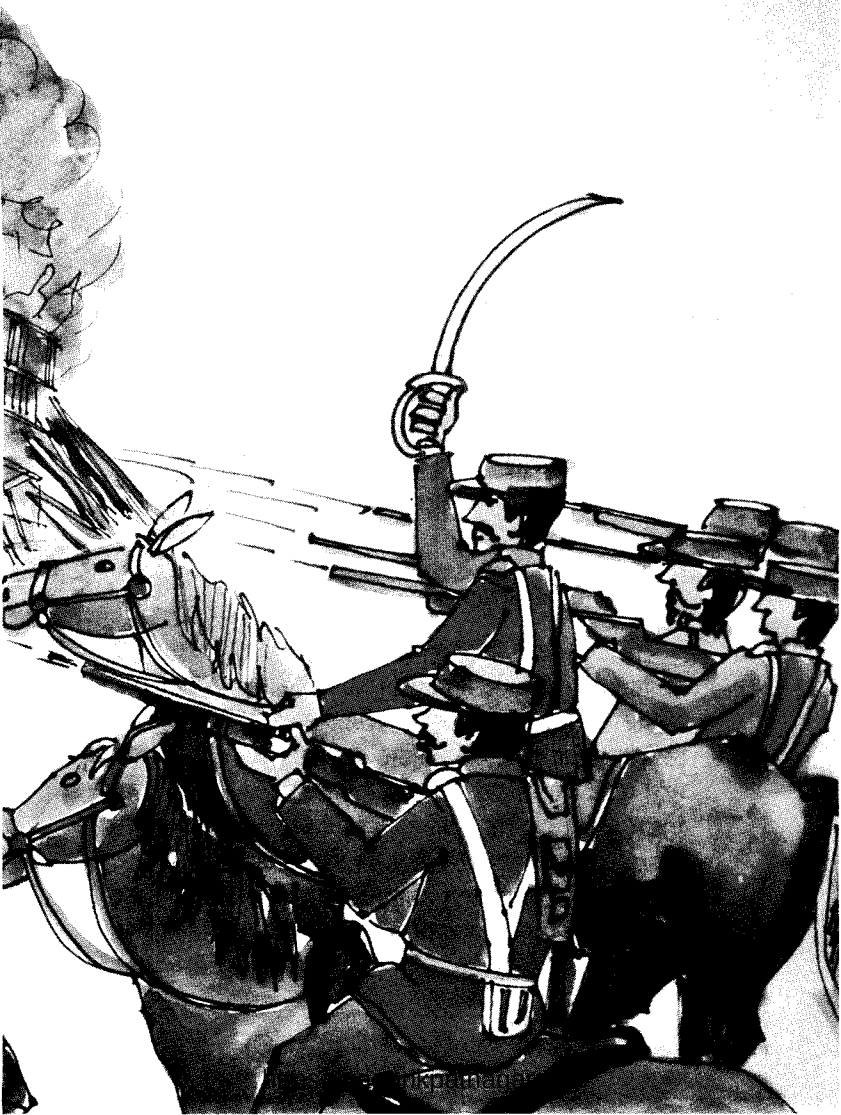

উদ্দেশ্য ছিল বিধর্মী ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদ করে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ওয়াহাবীগণ দ্রুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবে শিখ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য তাঁরা ধর্মযুদ্ধ শুরু করেন।

– শিখদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ? শিখরা তো আর ইংরেজ-শাসন চালাচ্ছিল না।

– হ্যাঁ, সেটা ঠিক। এটাই এই আন্দোলনের একটা দুর্বলতা ছিল। ভারতবর্ষ বহু ভাষা আর বহু ধর্মের দেশ। এই দেশে কোনো একটা বিশেষ ধর্মের মানুষ অন্যদের আলাদা করে দিয়ে সংগ্রামে সফল হতে পারে না। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াহাবীগণ পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার জয় করেন। কিন্তু তাদের এই সাফল্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ প্রাণ হারান এবং ওয়াহাবীরা পরাস্ত হন। পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার ওয়াহাবীগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ক্রমশ বাঙলা, বিহার, মীরাট ও অন্ধ্রের হায়দারাবাদে ওয়াহাবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে।

– বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলন কে করেন?

– বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর নিশার আলি। তিতুমীর নামে তিনি অধিক পরিচিত। ইংরেজদের অনুগত জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীরের প্রচারের ফলে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর বহু মুসলমান দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম ওয়াহাবীদের সংগ্রাম ছিল স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। কোলকাতার পূর্ব ও উত্তর দিকের গ্রামসমূহ, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর, মালদহ, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চল ক্রমে বিদ্রোহীদের করতলগত হতে থাকে। জনসাধারণের

https://nagorikpathagar.org

অর্থসাহায্যে তিতুমীর বাদুড়িয়া থানার দশ কিলোমিটার দূরে নারকেলবাড়ীয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে দলবলসহ সেখানে অবস্থান করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

– এই নারকেলবাড়ীয়া কোথায়?

– এটা বারাসাতে। এটা এখন পশ্চিমবঙ্গ। তবে আমাদের যশোরের খুব কাছে এই নারকেলবাড়ীয়া।

লর্ড বেন্টিঙ্ক তিতুমীরকে বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। তিতুমীর ও তাঁর ৬০০ অনুগামী কাঁচা বেল, ইট, তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে বাঁশের কেল্লা থেকে ব্রিটিশদের উপর আঘাত হানে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেজর স্কটের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী ইংরেজ-বাহিনী তিতুমীর ও তাঁর অনুগামীদের পরাজিত করেন। তিতুমীর তাঁর বহু অনুগামীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুম খাঁ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে কেল্লার সামনেই ফাঁসী দেওয়া হয়। এই ঘটনাই বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় আরও ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন।

– তিতুমীরের দলে কি শুধু মুসলমানেরাই ছিল?

– না, এখানেই তিতুমীরের মাহাত্ম্য। তিতুমীরের দলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ গরীব কৃষকেরা ছিল। এ বিষয়ে আমরা আবার নীল বিদ্রোহের গল্প শোনার সময় জানতে পারবো।

https://nagorikpathagar.org

ফরাজী আন্দোলন

তার মানে এখন আমরা নীল বিদ্রোহের গল্প শুনবো না? আমি বলি।

শুনবো, কিন্তু তার আগে আমরা ফরাজী আন্দোলনের গল্প শুনবো। ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শে মুসলিম সমাজে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮১৮ থেকে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাজী আন্দোলন চলে। 'ফরজ' শব্দের অর্থ ইসলাম-নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

ফরাজী আন্দোলনের মূল প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে 'ফরাজী' নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়ে তিনি সংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ কুসংস্কারমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কথা বলতেন। নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরাজীরা লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করেছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের গরীব হিন্দু-মুসলিম কৃষক, তাঁতী, কারিগর, শ্রমিক এই ফরাজী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বাঙলার নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের কাছে

https://nagorikpathagar.org

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলনের হাল ধরেন।

– বাবার কাছে থেকে দলের দায়িত্ব পাওয়ার রীতি তাহলে অনেক আগে থেকেই ছিল!

– হ্যাঁ, ছিল। বাবা হেসে বলে। বাঙলার অনেক বিদ্রোহের হাল ধরেছেন বিদ্রোহের প্রথম নেতার পুত্র।

দুদু মিয়া বা মহম্মদ মুহসীন ফরাজীর জমিদার, নীলকর ও সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর শ্লোগান ছিল 'যারা জমি চাষ করছে জমি তাদেরই' অথবা 'জমির মালিক ঈশ্বর'। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকা, পাবনা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, খুলনা ছাড়াও তার প্রভাবে ওপার বাঙলার ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে ফরাজী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

– এই আন্দোলন নষ্ট হলো কীভাবে?

– এই আন্দোলন আস্তে আস্তে তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র হারাতে থাকে। জোর করে অর্থ আদায় এবং দলভুক্তির জন্য এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলকরদের চাপে কোম্পানী ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দুদু মিয়াকে কারারুদ্ধ করে। কারারুদ্ধ অবস্থায় ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফরাজী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত থেমে যায়।

https://nagorikpathagar.org

সন্দ্বীপ বিদ্রোহ

এবার তাহলে নীল বিদ্রোহের গল্প? আমি বলি।

বাবা হেসে বলে, এবারও না। আমরা আরও কিছু বিদ্রোহের গল্প শুনে তারপর নীল বিদ্রোহে আসবো। এবার সন্দ্বীপ বিদ্রোহের গল্প।

ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার ত্রুটি, সুদখোর মহাজনদের নির্মম শোষণ, কৃষক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপর ইংরেজদের দমননীতি ইত্যাদির প্রতিবাদে বিভিন্ন সময়ে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, কারিগর, জেলে, মুচি, মেথর, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে শামিল হয়েছিল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে সন্দ্বীপ বিদ্রোহ ছিল অন্যতম।

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের বিদ্রোহ সন্দ্বীপ বিদ্রোহ নামে পরিচিত। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কয়েকটি ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টি হলো সন্দ্বীপ অঞ্চল। আবু তোরাপ চৌধুরী এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নিহত হন। পরে অত্যাচারী ওহদাদার গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে

https://nagorikpathagar.org

সন্দ্বীপের কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

– ওহদাদার আবার কী?

– মুঘল রাজস্ব সচিবকে ওহদাদার বলা হতো। গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের ওহদাদার হওয়ার সুযোগে আবু তোরাপের জমিদারী কেড়ে নিয়ে এক কর্মচারীর নামে বন্দোবস্ত করেন। পরে গোকুল ঘোষাল আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং অন্যদের জমিদারী গ্রাস করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা বাঙলার তৎকালীন গভর্নর কাটিয়ার সাহেবের কাছে সুবিচারের দাবী করেও প্রত্যাখ্যাত হয়। গোকুল ঘোষালের অত্যাচারে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন।

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সন্দ্বীপের কৃষকেরা মরিয়া হয়ে গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ সন্দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারেরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেন। গোকুল ঘোষাল বিদ্রোহ দমন অসাধ্য বুঝে ইংরেজদের কাছে অবিলম্বে একদল সৈন্য প্রেরণের জন্য আবেদন করে। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে একদল ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সন্দ্বীপে এসে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। এভাবে শেষ হয় সাগরদ্বীপ সন্দ্বীপের বিদ্রোহ।

https://nagorikpathagar.org

সাঁওতাল বিদ্রোহ
সিধু আর কানু

এবার কোন বিদ্রোহ? আমি বলি।

– এবার সিধু-কানুদের গল্প।

– তাঁরা কারা?

– তাঁরা সাঁওতাল বীর।

– তার মানে এবার সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প?

– হ্যাঁ। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল বাঙলার আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ। সাঁওতালরা ছিল বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হলে সাঁওতালদের ব্যবহৃত জোতজমি জমিদারদের হাতে চলে যায়। নতুন ব্যবস্থায় তারা জমিচ্যুত হয় ও আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়। এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা বিহারের হাজারীবাগ, মানভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, ওড়িশার কটক থেকে বাঙলা ও বিহারের সীমান্তবর্তী

https://nagorikpathagar.org

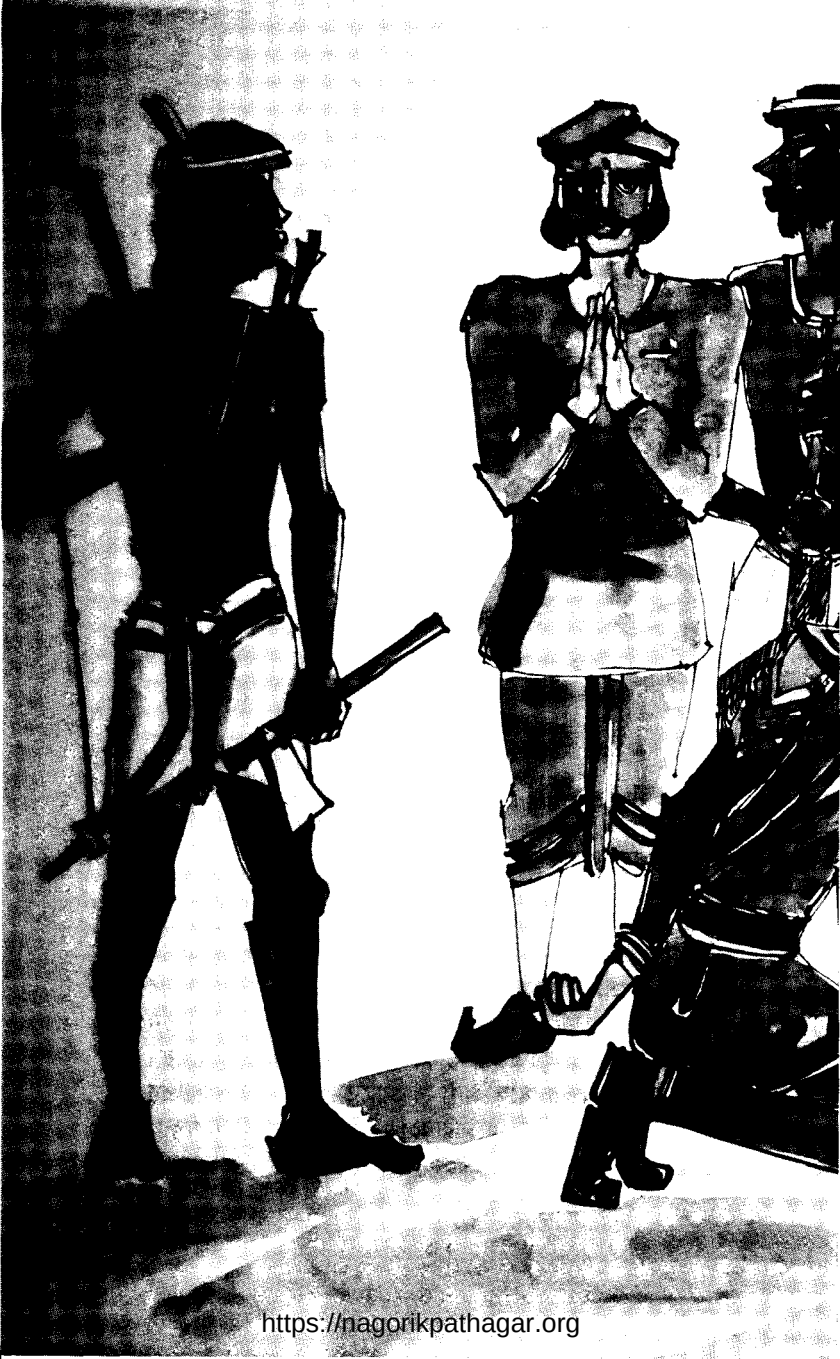

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

পার্বত্য এলাকা 'দামিন-ই-কোহি' অঞ্চলে আসতে থাকে। এই অঞ্চল বিহারের ভাগলপুর থেকে বাঙলার বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত। সাঁওতালরা কঠোর পরিশ্রম করে জঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করে এবং পতিত জমি চাষাবাদ করে নতুন জীবন শুরু করে। কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করলেও ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকে সাঁওতালদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

– কেন অসন্তোষ দেখা দেয়?

– স্থানীয় জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার এবং মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের চড়া সুদের চাপে সাঁওতালরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজসেনা অনেক ক্ষেত্রে সাঁওতাল রমণীদের সম্মানহানি করায় সাঁওতালদের মর্যাদায় আঘাত লাগে ও তারা জাতিগতভাবে অপমানিত বোধ করে। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন গোক্কো ও বীরসিং নামক গোষ্ঠীপতিদের উপর ইংরেজ সরকারের উৎপীড়নের প্রতিবাদে হাজার হাজার সাঁওতাল লাঠি, বল্লম, তীর, ধনুক নিয়ে দামিন অঞ্চলে সমবেত হয় এবং বিদ্রোহ করে।

বিদ্রোহ ক্রমশ বীরভূম অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই সিধু ও কানুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতালের এক সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে তাঁরা সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল অধিকার করে এক স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। ওই দিন থেকেই আনুষ্ঠানিক সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা হয়।

– সাঁওতালরা নিজেদের রাজ্য কায়েম করেছিল? আমি অবাক হয়ে জানতে চাই।

– হ্যাঁ, করেছিল, কয়েকদিনের জন্য হলেও করেছিল। বাবা বলে চলে।

https://nagorikpathagar.org

বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা জমিদার-মহাজনদের সম্পদ দখল, ইংরেজ কর্মচারী ও মহাজনদের হত্যা, তাদের সম্পত্তি ধ্বংস ও গৃহে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মেতে ওঠে। তারা ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে ডাক ও রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সমগ্র অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। অনেক ইংরেজ কর্মচারী, জমিদার, মহাজন সাঁওতালদের হাতে প্রাণ হারায়।

– এইরকম খুনোখুনি না করলে হতো না?

– বিদ্রোহ সাধারণত সুশৃঙ্খল হয় না। আর দূরদর্শী নেতা না হলে এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য আগে থেকেই কেউ তেমন চিন্তা করে না।

সিধু ও কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাঁওতালরা ইংরেজ রাজত্বের অবসান এবং স্বাধীন সাঁওতাল রাজত্বের কথা ঘোষণা করে। সরকারকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষও এই সাঁওতাল বিদ্রোহে শামিল হয়। কামার, কুমোর, গোয়ালা, তেলি, চামার, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগ দিলে সাঁওতাল বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। ইংরেজ-শাসক প্রথম দিকটায় এই বিদ্রোহকে গুরুত্ব দেয়নি। মেজর বুরাফ নামক এক ইংরেজ সেনাপতি সাঁওতালদের হাতে পরাজিত হলে ইংরেজ-শাসকেরা এই বিদ্রোহের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

– সাঁওতালরা কি ভালো যোদ্ধা ছিল?

– সাঁওতালরা ভালো শিকারী। সেই সূত্রে তীর-ধনুক ভালো চালাতে পারতো। সেই অর্থে তাঁরা যোদ্ধা জাতি নয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ।

– তারপর কী হলো?

https://nagorikpathagar.org

– এরপর এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠানো হলো। ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের তীর-ধনুকের লড়াই একটা অসম যুদ্ধ। কিন্তু সাঁওতালরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত এই অসম যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজয় বরণ করেন। সিধু ও কানুসহ নেতৃস্থানীয় সাঁওতালদের ফাঁসী দেওয়া হয়। ৩৬টি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস এবং পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহ দমনের পর সরকার সাঁওতালদের একটি পৃথক উপজাতি হিসেবে স্বীকার করে। রাজমহল এলাকাসহ বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে সাঁওতাল পরগণা গঠিত হয়।

https://nagorikpathagar.org

কোল বিদ্রোহ

এরপর কোন বিদ্রোহ? আমি বলি।

– এরপর আরেক আদিবাসী বিদ্রোহ।

– আদিবাসীদের কথা তো আগে বলোনি।

– বলেছি। সাঁওতালরাও একটা আদিবাসী।

– মানে? তারা কি আদি থেকে এখানে বাস করতো?

– শুধু আদি থেকে বাস করলেই তাদের আদিবাসী বলে তা নয়। এরা বিশেষ সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীও।

– ঠিক আছে, কোন আদিবাসী বিদ্রোহের গল্প এবার?

– এবার কোল বিদ্রোহের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যেসব আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটে তাদের মধ্যে কোল বিদ্রোহ ছিল অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকেই কোল সম্প্রদায় বর্তমান বিহারের সিংভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করতো। কোলরা হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এরা মূলত বনবাসী ও

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীনচেতা। অন্যান্য আদিম জাতিগুলোর মতো কোলরাও ছিল কৃষিজীবী। নতুন ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ইংরেজ সরকার বহিরাগত লোকদের কোল সম্প্রদায়ের জমিদার হিসেবে নিযুক্ত করে। তারা চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোল সমাজের নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতির উপর আঘাত হানে; শোষণ, বঞ্চনা, ভূমি থেকে উচ্ছেদের কারণেই ১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কোল বিদ্রোহের মূলে ছিল কৃষি অসন্তোষ।

১৮২০-১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পোড়াহাটের জমিদার ও তার ইংরেজ সেনাপতি রোগসেসের বিরুদ্ধে 'চাইবাসার যুদ্ধে' কোলরা পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তীর-ধনুক, বর্শা, বল্লম নিয়ে আধুনিক অস্ত্রধারী ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠা কোলদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর কিছুদিন পর ১৮৩১-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কোলরা আবার বিদ্রোহ করে। সিংরাই, বুদ্ধ ভগৎ, জোয়া ভগৎ, বিন্দাই মাংকি, সুই মুণ্ডা প্রভৃতি নেতা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

রাঁচি, হাজারীবাগ, মানভূম, সিংভূম, পালামৌ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কোল বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। কোল বিদ্রোহের পাশাপাশি মানভূমের ভূমিহীন জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে সরকারী কাছারি ও পুলিশ ঘাঁটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করতে হয়। কোল বিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, বিদ্রোহ চলাকালে কোলদের ঐক্যবদ্ধ রূপ। তাছাড়া বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ ও বহিরাগত জমিদারবর্গ। কোল বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভূমি থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। সুযোগ্য নেতার অভাব, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা, শিক্ষিত মানুষের সমর্থনের অভাব ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে কোল বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

https://nagorikpathagar.org

কোল বিদ্রোহের পরে তাদের ও অন্য আদিবাসীদের জন্য একটি ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

https://nagorikpathagar.org

পাগলাই ধুম

এবারে নিশ্চয় নীল বিদ্রোহের গল্প? আমি বলি।

বাবা হেসে ওঠে। এবার পাগলদের বিদ্রোহ।

– পাগলদের বিদ্রোহ! এ আবার কেমন? পাগল বিদ্রোহ করতে পারে?

– হ্যাঁ, সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর অঞ্চলে পাগলপন্থীদের এক বিদ্রোহ হয়।

– পাগলপন্থী আবার কী?

– পাগল বলা হতো আদর করে। এরা এক ধরনের বিশেষ জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল। আমরা যেমন করে 'পাগল ছেলে' বলি, তেমনি আদর করেই এদের পাগলপন্থী ডাকা হতো। নেত্রকোনায় ফকির বিদ্রোহ শেষে টিপু শাহ পাগলের নামানুসারে পাগলপন্থী বিদ্রোহরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। টিপু শাহের বাবা ছিলেন পীর করম শাহ পাগল। তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল গারো-হাজং জনগোষ্ঠীর মধ্যে। টিপু পাগল ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা।

https://nagorikpathagar.org

এই পাগলপন্থীদের বিদ্রোহকেই বলা হতো পাগলাই ধুম। এটা ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ। কৃষকেরা বর্ধিত খাজনা দিতে অস্বীকার করে, টিপু শাহকে নিজেদের রাজা ঘোষণা করে। এবং টিপুর নেতৃত্বে প্রায় দুই বছর নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা ধরে রাখে।

– এই বিদ্রোহ কীভাবে থামানো হয়?

– টিপু পাগলকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন জেলে রাখা হয়। এরপর ইংরেজরা বিদ্রোহীদের এলাকাতে ক্রমাগত সামরিক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহকে নির্মমভাবে থামিয়ে দেয়।

https://nagorikpathagar.org

সিপাহী বিদ্রোহ

এরপর? আমি বলি।

– এবার আমরা বাঙালীর তথা ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলবো। ইংরেজদের কাছে এটা ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহের কথা আমরা এরপর বলবো। এর আগে তোমাকে নিয়ে যাবো পুরান ঢাকায়।

– কোথায়? আমি উৎসাহ নিয়ে জানতে চাই।

– ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। সেখানে আছে বাহাদুরশাহ পার্ক।

আমরা অনেক জ্যাম পেরিয়ে গেলাম বাহাদুর শাহ পার্কে। বাবা বলতে শুরু করলো। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এখানে ঢাকার আর্মেনীয়দের বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল। যাকে স্থানীয়রা নাম দিয়েছিল আষ্টাঘর। বিলিয়ার্ড বলকে স্থানীয়রা আষ্টা নামে অভিহিত করতো। সেখান থেকেই এসেছে 'আষ্টাঘর' কথাটি। ক্লাবঘরের সাথেই ছিল একটি মাঠ বা ময়দান, যা আষ্টাঘর ময়দান নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই ময়দানেই এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণা পাঠ করে শোনান ঢাকা বিভাগের

https://nagorikpathagar.org

কমিশনার। সেই থেকে এই স্থানের নামকরণ হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৯৫৭ সালের আগে পর্যন্ত পার্কটি ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এক প্রহসনমূলক বিচারে ইংরেজ শাসকেরা ফাঁসী দেয় অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহীকে। তারপর জনগণকে ভয় দেখাতে সিপাহীদের লাশ এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে। ১৯৫৭ সালে (মতান্তরে ১৯৬১) সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এখানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে পার্কের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক। সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-এর শাসন পুনরায় আনার জন্য। তাই তাঁর নামানুসারে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।

– সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল? কার সিপাহী?

– ইংরেজদের আর্মি।

– ইংরেজদের আর্মি কি ইংরেজরা নিজেরাই ছিল না?

– না। বাবা হেসে বলে। অফিসারেরা ছিল ইংরেজ আর অধিকাংশ সিপাহীই ছিল ভারতীয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। এর আগে একশো বছর ধরে উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে।

https://nagorikpathagar.org

– এই বিদ্রোহ শুরু হলো কীভাবে এবং কী নিয়ে? আমি প্রশ্ন করি।

বাবা বলতে থাকে।

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে শুরু হয় বিদ্রোহ এবং দ্রুত তা মিরাট, দিল্লী এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ এই বিদ্রোহ গোটা উত্তর ও মধ্য ভারতে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তর-মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, মহাবিদ্রোহ, ভারতীয় বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের গণঅভ্যুত্থান নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৮৫৩ সালে ৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড (পি/৫৩) রাইফেল নামের এক ধরনের রাইফেল সৈন্যদের দেওয়া হয়। এই রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় দাঁত দিয়ে ভেঙে লাগাতে হতো। এটা প্রচারিত হয় যে কার্তুজটা তৈরী করা হয়েছে গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে। গরু ও শূকরের চর্বি মুখে দেওয়া হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের কাছে অধর্মের কাজ ছিল। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিপাহীরা (ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যরা) নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। তারা ব্রিটিশদের কাছে নতুন কার্তুজ প্রতিস্থাপন করার দাবী করেছিল, যা মৌমাছির তেল ও শাকসবজির তেল থেকে তৈরী হবে। কিন্তু তারা তা করেনি। সিপাহীদের কাছে গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এমনকি সিপাহী বিদ্রোহ সারা বাঙলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ তার প্রমাণ বহন করে।

https://nagorikpathagar.org

১৮৫৭ সালের ১১ মে মীরাট থেকে তিনশো বিদ্রোহী সিপাই দিল্লী এসে ৪৯ জন ব্রিটিশ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে এবং দিল্লীর দখল হাতে নিয়ে বাহাদুর শাহ জাফরকে মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। সম্রাটকে তাঁরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ জানান। অবস্থার চাপে পড়ে তিনি রাজী হলেও কর্তৃত্ব থেকে গিয়েছিল সিপাইদের হাতে। যদিও সকল আদেশ-নির্দেশ তাঁর নামে, তাঁর সীল-মোহরসহ বেরিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দিল্লী পুনর্দখল করে।

১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের পদাতিক বাহিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে এবং জেলখানা থেকে সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করে নেয়। কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই বিদ্রোহ ত্রিপুরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতীয় সমাজে যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ছিল এই ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ।

সেপাই মঙ্গল পাণ্ডের বিচার হয়। বিচারের নামে প্রহসন মাত্র। দণ্ডাদেশ– ফাঁসী। মঙ্গল পাণ্ডে তখনো অসুস্থ। হাসপাতালে শুয়ে আছে। ক্ষতস্থানগুলো ফুলে উঠেছে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। ৮ই এপ্রিল সকাল। অসুস্থ মুমূর্ষু সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডেকে ব্যারাকপুরে সমস্ত সৈনিকের সামনে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দণ্ডাদেশ কার্যকর করে ইংরেজ সরকার।

১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর ইংরেজ মেরিন সেনারা ঢাকার লালবাগের কেল্লায় অবস্থিত দেশীয় সেনাদের নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালায়। কিন্তু সেপাহীরা বাধা দিলে যুদ্ধ বেধে যায়। দেশীয় সেনারা ইংরেজদের ভারী অস্ত্রের কাছে টিকতে পারে না। পরাজিত হয়। যুদ্ধে আহত এবং পালিয়ে যাওয়া

https://nagorikpathagar.org

সেনাদের ধরে এনে এক সংক্ষিপ্ত মার্শাল আইনে বিচারের মাধ্যমে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১১ জন সিপাইকে আণ্টাঘর ময়দানে এনে দিনের বেলা জনসম্মুখে ফাঁসী দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে লাশগুলো বহু দিন যাবৎ এখানকার গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

– ইংরেজরা এমন পিশাচ ছিল? আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।

– হ্যাঁ। এ ঘটনার পর বহুদিন পর্যন্ত এই ময়দানের চারপাশ দিয়ে মানুষজন হাঁটতে ভয় পেতো। এই স্থান নিয়ে বিভিন্ন ভৌতিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহে আর যাঁরা নিহত হয়েছিল তাঁদের বহু লাশ লালবাগ (আজিমপুর এতিমখানার পাশে) একটা ডোবায় ফেলে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। সেটা থেকে গোর-এ-শহীদ মাজারের উৎপত্তি। এই এলাকাকে মানুষ এখনো গোর-এ-শহীদ মাজারের নামে চেনে।

https://nagorikpathagar.org

নীল বিদ্রোহ ও তার নায়কেরা

এইবার নিশ্চয় নীল বিদ্রোহের গল্প? আমি বলি।

বাবা একটু থেমে থাকে। খানিক পরে বলে, হ্যাঁ, এইবার নীল বিদ্রোহের গল্প। ইংরেজ আমলের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ ছিল নীল বিদ্রোহ। ১৮৩৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে আইনবলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেসব ইংরেজ কর্মচারী সেখানে রবার চাষে ক্রীতদাসদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালাতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের বাঙলায় এনে নীলকর বানিয়ে দেওয়া হয়। তারা এখানে এসে নীল ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদার, এমনকি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দখল করে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তারা এ দেশের সাধারণ কৃষকের উপর যে সীমাহীন অত্যাচার চালায়, তার তুল্য মর্মান্তিক ঘটনা আজও বিরল। এ বিষয়ে একটা চমৎকার ব্লগ আছে একজন বাঙলাদেশের তরুণ ব্লগারের। তার নাম প্রফেসর শঙ্কু। অনেক খেটে-খুটে গবেষণা করে বাঙলা ব্লগে নীল বিদ্রোহের ইতিহাস লিখেছেন তিনি। সেখান থেকেই গল্প শোনাই তোমাকে।

– কিন্তু নীল কী জিনিষ? এটা ইংরেজদের কাছে এত গুরুত্ব হলো কেন?

https://nagorikpathagar.org

নীলকরদের
অত্যাচার

– তাই তো! এটা আগে তোমাকে বলি। সাদা কাপড়ে নীল দিলে সাদা কাপড় আরও উজ্জ্বল হয়। ইংরেজদের কারখানায় তখন অনেক সাদা সুতির কাপড় তৈরী হতো। সেই কাপড় উজ্জ্বল করার জন্য অনেক নীলের প্রয়োজন হতো।

– তাহলে এখন নীল চাষ কোথায় হয়?

– এখন আর নীল চাষ হয় না। রঙ করার জন্য স্বল্পমূল্যের কেমিক্যাল আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তখন এর বিকল্প ছিল না। তাই নীলকরদের সামনে প্রজারা ছিল অসহায়। আইন-আদালত তো দূরের কথা, তাঁদের সাথে নবাব-বাদশাহদেরই সংশ্রব ছিল না। এ অবস্থায় তারা নিরুপায় হয়ে দাদনী চুক্তিপত্রে টিপসই দিতো এবং নীল চাষ করতে বাধ্য হতো। দাদনী চুক্তিপত্র বা একরারনামা ছিল একটুকরা সাদা কাগজ, যার উপরে প্রথমে কৃষকের টিপসই নেওয়া হতো, তারপর গোমস্তাকে দিয়ে ইচ্ছেমতো শর্তাদি লিখিয়ে নেওয়া হতো।

এই চুক্তিপত্রে কৃষকের সকল উৎকৃষ্ট জমির কথা লেখা থাকতো, কিন্তু সে তা জানতে পারতো না। সারা বছর সার-মাটি দিয়ে, লাঙল চষে, বৈশাখ মাসে মাঠে ধানের বীজ নিয়ে গিয়ে কৃষক দেখতো তার জমিতে খুঁটি গেড়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই জমিতে নীল চাষ করতে হবে। সন্ধ্যাবেলা তাগিদগীর এসে জানিয়ে যেতো, কৃষক যেন ভোরে গিয়ে নীলের বীজ ও দাদনের টাকা নিয়ে আসে। অন্যথা হলে তাঁকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো।

– যেখানে দাদনের টাকা ও বীজ দেওয়া হতো, সেখানে নীল চাষে ক্ষতি কোথায়? আমি বলি।

– প্রথমত, নীল ছাড়া অন্য কোনো শস্য চাষ করার জন্য চাষীর হাতে আর কোনো জমি থাকতো না। দ্বিতীয়ত, এক

https://nagorikpathagar.org

বিঘা জমিতে নীল চাষ করে চাষীর যা খরচ হতো আয় হতো তার এক-তৃতীয়াংশ। নীল চাষ মানেই ক্ষতি। অন্য কোনো জমিতে ধানপাট চাষের জন্য অনুমতি না থাকায় কৃষক এই ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণ করতে পারতো না। তাকে টাকা ধার করতে হতো। এভাবে কৃষকের পিঠে ঋণের বোঝা ক্রমে ক্রমে আরও বাড়তো।

নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছে দেওয়ার ভাড়া দিতো কৃষক। দেরি হলে পেয়াদার দল এসে কৃষকের খাসী-মুরগী-ছাগল ধরে নিয়ে যেতো; আম, কাঁঠাল, লিচুর গাছ কেটে তছনছ করে দিতো। নীলক্ষেতে যে ঘাস জন্মাতো, তার উপরেও কৃষকের কোনো অধিকার ছিল না। ভুলে গরু-ছাগল ছুটে ক্ষেতে গেলে পাহারাদার সেগুলো ধরে নিয়ে যেতো, আর দিতো না। সরকারও এই অত্যাচারে মদত দিতো।

– তাহলে তো নীল চাষীদের ক্রীতদাসদের মতো ব্যবহার করা হতো?

– হ্যাঁ, ঠিক তাই। শুধু তা-ই নয়, ১৮৩০ সালে আইন জারী হয়, যারা নীলচুক্তি ভঙ্গ করবে তাঁদের ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা যাবে ও সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে। এভাবে নীলচাষে লোকসান দিয়ে, অর্থকরী ফসল-গবাদিপশু-গাছপালা হারিয়ে নিরন্ন, বিবস্ত্র ও অসহায় হয়ে চাষীরা যেতো মহাজনের কাছে। কিন্তু মহাজনের পুরো ঋণ শোধানো তো দূরের কথা, সুদের টাকাও তার দেওয়ার সামর্থ্য হতো না। একদিন দেখা যেতো আদালতের ডিক্রীবলে মহাজন তার ভিটেমাটি, পৈতৃক জমি দখল করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পথে। আর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাই একদিন রুখে দাঁড়ালো কৃষক। এটাই নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এটা আসলে কৃষক বিদ্রোহ।

https://nagorikpathagar.org

– সরকার ছিল নীলকুঠি মালিকদের পক্ষে। এমনকি নীলকুঠির মালিকদের সম্পদ রক্ষায় এক থেকে সাতজন পর্যন্ত খুন করে ফেলার ইনডেমনিটি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

– তার মানে লাইসেন্স টু কিল!

– হ্যাঁ, লাইসেন্স টু কিল! এই থেকে 'সাত খুন মাফ' বাগধারার উৎপত্তি।

– এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় কোথায়?

– ঠিক কোথায় প্রথম বিদ্রোহের সূচনা তা নিয়ে নানা মত বিদ্যমান। একটা মত হচ্ছে ১৮৪৪ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারী নীলকুঠিতে সর্বপ্রথম মানুষ ক্ষেপে ওঠে এবং আগুনে কুঠিটিকে ভস্মীভূত করে। কারো মতে চৌগাছা কুঠিতে এর সূত্রপাত। আবার কারো মতে, উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। তাদের মতে, বিহারের আওরঙ্গবাদ মহকুমার এন্ড্রোজ কোম্পানীর আঙ্কারা নীলকুঠির উপরে সর্বপ্রথম আক্রমণ করার মাধ্যমে বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে অধিকাংশই মনে করেন যে, চূর্ণী নদীর তীরে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের খাল বোয়ালিয়া ও আসাননগর কুঠিতে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়। সুতরাং বিদ্রোহ যে বাঙলাদেশে শুরু হয়, সে-বিষয়ে সবাই একমত। সারা দেশেই শুরু হয় বিদ্রোহ। একেক জায়গায় একেক রকমভাবে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে।

– কী রকম?

– যেমন এই বিদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলন হিসেবে শুরু করেন মালদহ জেলার কৃষকেরা এবং তার পূর্ণতা সাধন করেন উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা। আর সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন টাঙ্গাইলের কাগমারীর কৃষকেরা এবং পূর্ণতা পায় চুয়াডাঙ্গা এলাকার কৃষকদের হাতে।

https://nagorikpathagar.org

– অসহযোগ আন্দোলন কী?

– এটা হচ্ছে সরকারের সাথে কোনো বিষয়ে সহযোগিতা না করা বা সরকারের কোনো আদেশ পালন না করা। নীল চাষ থেকে সৃষ্ট দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ১৮৫৮ সালে অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ১৮৫৯ সালে বিদ্রোহ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই অসহযোগ আন্দোলন ঠেকাতে কুঠিয়াল ও জোতদারেরা লাঠিয়াল বাহিনী নামায় ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে, ফলে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের কেন্দ্রে ছিল কৃষকদের লাঠিয়াল বাহিনী।

'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামে মাসিক পত্রিকায় দুজন জার্মান পাদ্রি চুয়াডাঙ্গার বিপ্লবীদের লাঠিয়াল বাহিনী সম্পর্কে লেখেন, "অপটু কৃষক যোদ্ধাগণ নিজেদের ৬টি কোম্পানীতে বিভক্ত করেছে। ১ম কোম্পানী তীরন্দাজদের নিয়ে গঠিত। ২য় কোম্পানী গঠন করা হয় প্রাচীনকালের ডেভিডের মতো ফিঙা দিয়ে গোলক নিক্ষেপকারীদের নিয়ে। ইটওয়ালাদের নিয়ে ৩য় কোম্পানী। এঁরা পরিধেয় লুঙ্গিতে মাটির বড় বড় ঢেলা, ইট-পাটকেল বহন করে এবং ছুড়ে মারে। ৪র্থ কোম্পানী গঠিত বেলওয়ালাদের নিয়ে, যাঁদের কাজ হলো নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর মস্তক লক্ষ্য করে শক্ত কাঁচা বেল ছুড়ে মারা। থালাওয়ালাদের নিয়ে ৫ম কোম্পানী। তাঁরা ভাত খাবার কাঁসা ও পিতলের থালাগুলো আনুভূমিকভাবে চালাতে থাকে। এতে শত্রুনিধন যে ভালোভাবেই হয় তাতে সন্দেহ নেই। ৬ষ্ঠ কোম্পানী মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়। তাঁরা হাতে মাটির পোড়ানো খণ্ড, মাটির বাসন ও রুটি বেলার বেলন নিয়ে আক্রমণ করে থাকে। প্রথমে তাঁরা লাঠিয়ালদের দিকে মাটির খণ্ড ও বাসনকোসন ছুড়ে মারে। এতে লাঠিয়াল যদি ভূপাতিত হয়, তখন তাকে বেলনপেটা করা হয়।

https://nagorikpathagar.org

আর যারা যুদ্ধে পটু, তাঁদের নিয়ে মূল কোম্পানী গঠিত। এঁরাই কৃষক লাঠিয়াল, এঁরা সম্মুখ সমরে অংশ নেয়। এই কোম্পানীর অর্ধেক বল্লমধারী, অর্ধেক লাঠিধারী। সবার সামনে থাকে বল্লমধারী, তাঁদের পর লাঠিয়ালরা, এবং তারপর বাকী পাঁচ কোম্পানী। এঁদের বীরত্ব কিংবদন্তীসম। একজন বল্লমধারী নাকি ১০০ জন শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করতে পারে। সংখ্যায় এঁরা কম হলেও এতটাই দুর্ধর্ষ যে, তাঁদের ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালরা পুনরায় আক্রমণ করতে সাহস করতো না।"

অর্থাৎ তখন কৃষকদের মূল শক্তি ছিল এই লাঠিয়াল-বল্লম বাহিনী। লাঠিচালনা শিক্ষার জন্য প্রধান ঘাঁটি ছিল বরিশাল, রংপুর ও টাঙ্গাইল। এখানকার ওস্তাদেরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং জায়গায় জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তখন লাঠিচালনা শেখাটা ছিল গৌরবের বিষয় ও পৌরুষের প্রমাণ। কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে লাঠিয়ালেরা তখন বীরদর্পে সুসজ্জিত শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ঠেকিয়েছে এবং তাদের ঠেঙিয়েছে। অনেক অঞ্চলে 'পলো বাহিনী' ছিল। তারা পলো ও ঝাঁকিজাল কাঁধে নিয়ে এবং হাতে জুতি ও কোঁচ নিয়ে অগ্রসর হতো। প্রমোদ সেনগুপ্ত নামে এক ইতিহাসবিদ লিখেছেন, "নানা অঞ্চলে নানা বাহিনী চালু ছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে তীর, ধনুক, বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত বাহিনী ছিল। এদের মাঝে পাবনার নীল বিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম বন্দুক ব্যবহার করে।"

এছাড়া ছিল তিতুমীরের 'হামকল বাহিনী' এবং ফরাজী আন্দোলনের অনুসারীদের 'দুন্দুভি বাহিনী'র কথাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি বাহিনী ও কৃষক-বাহিনীর বিদ্রোহের বিষয় ভিন্ন হলেও এই বাহিনীত্রয়ের লক্ষ্য ছিল একটাই, অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের ধ্বংসসাধন। তিতুমীরের হামকল বাহিনীর

https://nagorikpathagar.org

ব্যারাক ছিল হুলিয়ামারীতে। এই হামকল বাহিনী ভারী কাঠের মুগুর ব্যবহার করতো এবং বাঁশ দিয়ে তৈরী নানা ধরনের যন্ত্র তৈরী করতো, যা নীলকরদের কুঠি ধ্বংসে ব্যবহার করা হতো। যেখানেই গোলাবাড়ী ও নীলকুঠি ছিল, সেখানেই এই বাহিনী তাঁদের আক্রমণ করতো। নীল বিদ্রোহে এমন কোনো লড়াই হয়নি, যেখানে হামকল বাহিনী অংশগ্রহণ করেনি।

আর দুন্দুভি বাহিনী সম্পর্কে ইতিহাসবিদ অনাথনাথ বসু লিখেছেন, "নীলকরের লাঠিয়াল হইতে আত্মরক্ষার এক অপূর্ব কৌশল কৃষকগণ আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন কুঠিয়ালগণের লাঠিয়ালরা গ্রাম আক্রমণের উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী গ্রামের রায়তগণকে বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেই সকলে আসিয়া দলবদ্ধ হইত।" সতীশচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রামের সীমানায় এক স্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোক অত্যাচার করিতে আসিলে কেহ সেই ঢাক বাজাইয়া দিতো। অমনি শত শত গ্রাম্য কৃষক লাঠিসোঁটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত দেহে পলাইতে পারিত না। সম্মিলিত প্রজা শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।"

নীলকরদের কুঠিয়ালেরা পুলিশের সাহায্যে হাজার হাজার কৃষককে গ্রেফতার করে, তাঁদের বাড়ীঘর-মালামাল ক্রোক করে নেয়, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে এবং শত শত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকাল ধরে তাঁদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। এই অত্যাচারে কৃষকশ্রেণী ফুঁসে ওঠে, এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শীতের মধ্যভাগ থেকে শুরু হয় নীলকরদের উপর সশস্ত্র পাল্টা আক্রমণ।

https://nagorikpathagar.org

কুষ্টিয়ার পিয়ারী সুন্দরী

টমাস আইভান কেনি তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় নীল কারবারের অধিকারী ছিল। কেনি ছিল অত্যন্ত জুলুমবাজ; হত্যা-ধর্ষণ এগুলো তার কাছে সামান্য ব্যাপার ছিল। তার কয়েকটি কুঠি ছিল আমলা সদরপুরের পিয়ারী সুন্দরীর জমিদারীর ভেতরে। কেনির বিরুদ্ধে ১৮৫০ সালে রায়েতগণ বিদ্রোহ করে। কিন্তু কেনি শক্ত হাতে তা দমন করে এবং সকল রায়েতকে উচ্ছেদ করে নতুন রায়েত বসায়। পিয়ারী এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি কেনিকে প্রজাদের উচ্ছেদ করার কাজে নিষেধ করেন। এতে কেনি তাঁকে গালিগালাজ করে এবং জমিদারী কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখায়।

– জমিদারকে নীলকরেরা মানতো না?

– না, তারা ছিল জুলুমবাজ আর দুর্বিনীত।

– এর পরে কী হয়?

– এই ঘটনার দশ বছর পরে ওই উচ্ছেদকৃত রায়তেরা সংগঠিত হয়ে ফিরে আসে। পিয়ারী সুন্দরী তাঁদের সাথে যোগ দেন। ওই বছরই কৃষকেরা সংগঠিত হয়ে এপ্রিল মাসে তারা কেনির কুঠিতে হামলা করে। কেনি বেঁচে যায়, কিন্তু তার কুঠি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরপর পিয়ারী সুন্দরী ও তাঁর রায়তদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করা হয়। পিয়ারী সুন্দরী সকল মামলার খরচ কুলাতে না পেরে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। বিদ্রোহী প্রজাদের দ্বীপান্তর, জেল-জরিমানা হয়। পিয়ারী এই ঘটনার পাঁচ বছর পর যশোরের এক মুচির বাড়ীতে বিনা চিকিৎসায় পরিজনহীন অবস্থায় টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

https://nagorikpathagar.org

কৃষক দরদী পিয়ারীর কথা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু কেনিকে আমরা ভুলিনি। কুষ্টিয়ার কেনি রোডের নামকরণ এই নীলচাষীর নামে করা ছিল। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া নির্মমতার ইতিহাস আমরা না বুঝেই রেখে দিয়েছি। নিপীড়ক কেনির নাম শত শত বছর ধরে উচ্চারিত হয়েছে তাদের মুখেই যাদের পূর্বপুরুষেরা কেনির হাতে নির্যাতিত হয়েছিল। সম্প্রতি সেই রাস্তার নাম পরিবর্তিত হয়েছে।

নদীয়ার বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ

গণমানুষের এমন ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বীরত্বের ঘটনা এই নীল বিদ্রোহকে মহাকাব্যিক দ্যোতনা দিয়েছে। অসংখ্য বীরের জন্ম দিয়েছে এই বিদ্রোহ। তেমনই একজন বিশে ডাকাত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই বিশে ডাকাতকে নিয়ে ছোটদের জন্য একটা বই লিখেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাপতির নিবন্ধে উল্লেখ করে লিখেছেন, "বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত, আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।"

এই বিশে ডাকাত ছিল রবিনহুড সদৃশ এক বীর। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতেই, স্যামুয়েল ফেডির নীলকুঠি লুণ্ঠন করেন বিশ্বনাথ সরদার, ওরফে বিশে ডাকাত। বিশ্বনাথ জাতিতে ডোম বা বাগদী ছিলেন। তিনি তিতুমীরের হামকল বাহিনীতে কিশোর বয়সে যোগ দেন। পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের পরে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। এই ঘটনা প্রমাণ দেয়, তিতুমীরের বাহিনী শুধু মুসলমানদের বাহিনী ছিল না। এটা ছিল ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে কৃষকদের বাহিনী।

গ্রামে ফিরে আসার পরে একদল যুবককে তিনি নীলকুঠি দখল

https://nagorikpathagar.org

ও ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দেন এবং নদীয়া জেলার কুনিয়ার জঙ্গলে ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি নদীয়ার আশেপাশের বহু নীলকুঠি ও নীলের কারবার ধ্বংস করে দেন। এর ফলে জেলা-প্রশাসক ইলিয়ট এবং নীলকর ফেডি ভীত হয়ে পড়েন। সরকার ও নীলকরেরা তাঁর নাম তৎকালীন ব্রিটিশ ওয়ান্টেড লিস্টে 'বিশে ডাকাত' হিসেবে ওঠায়। বিশ্বনাথের মাথার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

এরপর বিশ্বনাথ কুঠিয়াল ফেডির বাসভবন ও কুঠি আক্রমণ করেন। বিশ্বনাথের প্রধান সেনাপতি মেঘাই সরকার ফেডিকে বন্দী করে বাগদেবী খালের তীরে নিয়ে আসে। ফেডি বিশ্বনাথের কাছে প্রাণভিক্ষা চায় এবং যিশুর নামে প্রতিজ্ঞা করে যে সে ব্যবসা উঠিয়ে ব্রিটেনে চলে যাবে। বিশ্বনাথ তাকে ছেড়ে দেন। ফেডি ছাড়া পেয়ে সেদিন দুপুরেই বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেয়।

– ফেডি কীভাবে বিশে ডাকাতকে ধরিয়ে দিলো? আমি জানতে চাই।

– সেটা আমি জানি না। তবে কিছুদিন পরেই বিশ্বনাথ দিনাজপুর জেল থেকে পালান এবং পালানোর চার দিন পর তিনি আবার ফেডির ঘরে হানা দেন। কিন্তু এবারও ফেডি নীলচাষ তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিশ্বনাথের ইষ্টদেবতার দোহাই দিয়ে ক্ষমা চান। বিশ্বনাথ এবারও তাকে মাফ করে দিয়ে চলে আসেন।

সাক্ষাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে ফেডি এবার বিশ্বনাথকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সরকারের কাছে আবেদন করে সে সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি দলকে বিশ্বনাথের খোঁজে লাগায়। শুরু হয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম

https://nagorikpathagar.org

ম্যানহান্ট। তারা বিশ্বনাথের পালক পুত্র পঞ্চাননকে ধরতে সক্ষম হয়। পঞ্চানন পুরস্কারের লোভে বিশ্বনাথের ঘাঁটির কথা ফাঁস করে দেয়। পরের দিন ব্ল্যাকওয়ারের সেনাবাহিনী কুনিয়ার জঙ্গল ঘিরে ফেলে, অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথ তাঁর অনুচরদের বাঁচাতে নিজে ধরা দেন ও সমস্ত কর্মকাণ্ডের দায়ভার নিজের উপরে নিয়ে নেন। ফেডির মুখোমুখি হয়ে বিশ্বনাথ বলেন, "গোরা সাহেব, আমি তোমার জুলুম থামিয়ে দিয়ে সংসারজীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি বাদ সাধলে। কিন্তু মনে রেখো, যে জীবন তুমি ভোগ করছো, তা আমার দান। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

গঙ্গার তীরভূমিতে বিশ্বনাথকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তাঁর মৃতদেহ সবাইকে দেখানোর উদ্দেশ্যে লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে একটা অশ্বত্থ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

– বিশে ডাকাতের তাহলে ফেডিকে বার বার ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

– সেটা তো হয়নি। কিন্তু আজকে যেই আত্মগর্বী ব্রিটিশ জাতিকে দেখো, তাদের পূর্বপুরুষ কত নির্লজ্জ, নিপীড়ক আর বিশ্বাসঘাতক ছিল সেটা কি এত সহজে বুঝতে পারতে?

– না, সেটা অবশ্য বোঝা যেতো না।

– বিশে ডাকাত তার জীবন দিয়ে বাঙালীর মহত্ত্বকে শুধু ঊর্ধ্বে তুলে ধরেননি, ব্রিটিশদের নীচতাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

https://nagorikpathagar.org

খুলনার নীলকর শিবনাথ

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক রেনি খুলনা জেলার ইলাইপুর তালুক পত্তনি নিয়ে নীলের কারবার শুরু করে। রেনি তার ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কারণে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। তার পেয়াদা বাহিনীর ভয়ে কুঠির সামনে দিয়ে দিনের বেলায়ও লোক চলাচল করতো না। খুলনায় এমন প্রবাদও প্রচলিত ছিল–

শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে
রেনি সায়েবের গাঁতা পাবে,
খড় কাটিতে হবে মাঠে
জাল হাতে দাঁড়াও ঘাটে।

রেনি পথচারীদের ধরে কুঠির কাজ করিয়ে নিতো, আর এই 'কাজ করিয়ে নেওয়ার' সময়কাল কখনও কখনও সাত-আট দিন স্থায়ী হতো।

– তার মানে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়া?

– ঠিক তাই। কিন্তু একটা মজার ঘটনা ঘটে।

– কী ঘটনা? আমি উৎসাহী হয়ে জানতে চাই।

– রেনির কুঠির পাশে আরেক নতুন দেশী নীলকর শিবনাথ কুঠি স্থাপন করেন। ইনিও প্রথমে একজন অত্যাচারী নীলকর ছিলেন। রেনি পাইক-পেয়াদা বাহিনী পাঠিয়ে দেন শিবনাথের কুঠি পুড়িয়ে দিতে। শিবনাথ তাঁর নিজের পাইকদের নিয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। শুরু হয় দু'পক্ষের মাঝে মারামারি। রেনির পক্ষে ছিল প্রাক্তন 'গোরা' সৈনিক এবং দেশী পাঁচ

https://nagorikpathagar.org

হাজারের বেশী পেয়াদা নিয়ে তৈরী বাহিনী। আর শিবনাথকে দেশী মানুষ দেখে তাঁর পক্ষে আসে বিখ্যাত সব লাঠিয়াল-সরদার। সাধারণ চাষী ও সহায়-সম্বলহীন কৃষকেরাও তাঁকে সমর্থন করতে থাকে।

– কিন্তু শিবনাথও তো নীলকর ছিল?

– হ্যাঁ, সেটা ঠিক। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করতো শিবনাথ তাদের লোক, কারণ সে বাঙালী। এটাকেই বলে জাতিগত সংহতি। এই শিবনাথ ও রেনির মাঝে খণ্ডযুদ্ধ লেগেই থাকতো। তাঁদের যুদ্ধ নিয়ে জারিগানও গাওয়া হতো–

চন্দ্র দত্ত রণে মত্ত, শিব সেনাপতি
গহরতুল্লাহ গেলে গোলা, ছুঁড়ে মারে হাতী।
সাদেক মোল্লা লাঠিয়ে গোলা রেনির দর্প করলে চুর
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা ধন্য বাঙালী বাহাদুর।
খান মাহমুদ সড়কি চালে যেন কামানের গুলি
দিশেহারা রেনির গোরা চক্ষুভরা ধূলি।

দুই প্রতিপক্ষের কুঠিই বার বার লুণ্ঠিত হয়, কুঠি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। রাতের বেলা রেনি শিবনাথের কুঠির গোলা ও নীলগুদাম ধ্বংস করে দিলো তো পরের দিন সকালেই শিবনাথ রেনির নীলবোঝাই নৌকাবহর ডুবিয়ে দিলো। এদের মারামারি থামাতে সরকার নয়াবাদ থানা ও খুলনা মহকুমা স্থাপন করে, সরকারী সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুই দলের দাঙ্গাবাজী ও লাঠিবাজীর মাঝে পড়ে সরকারী বাহিনী দুই মাসও টিকতে পারেনি। ১৮৫৫ সালে শিবনাথের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। শিবনাথ মারা যাবার পর তাঁর বাহিনী শেষ মরণকামড় দেয়। এই আঘাত রেনির বাহিনী ঠেকাতে পারেনি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নিয়েও প্রবাদ চালু হয়– 'দেখিয়া শিবের ভঙ্গি, পলাইল দীনেশ সিঙ্গি।' আর সেই সাথে নীল

https://nagorikpathagar.org

চাষও খুলনা থেকে উঠে যায়।

জমিদার মথুরানাথ ও সতী আরতি দেবীর নিগ্রহ

মৌলভীবাজারের সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য ছিলেন নীল চাষের ঘোর বিরোধী, এবং এই কারণে সিন্দুরিয়া কুঠির জমিদার ম্যাকনেয়ারের পরম শত্রু। ম্যাকনেয়ার কিছুতেই আচার্যকে বাগে আনতে না পেরে তাঁর পরিবারের উপর শোধ তুলবার পরিকল্পনা করে। জমিদার পুত্রবধূ আরতি দেবী স্বামী অমরনাথের সাথে জমিদারী নৌকা 'ময়ূরপঙ্খি' করে বাড়ী ফিরছিলেন। অকস্মাৎ ম্যাকনেয়ার তার বাহিনী নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ম্যাকনেয়ারের বন্দুকের গুলিতে অমরনাথ মারা যান। আরতি দেবীকে লাঞ্ছিত ও হত্যা করে ম্যাকনেয়ার; মৃত্যুর পরে মৃতদেহও বিকৃত করে।

– সর্বনাশ! এমন বীভৎস ছিল নীলকরেরা?

– হ্যাঁ, বলছি কী? আজকে ব্রিটিশরা তাদের দেশ আর জাতি নিয়ে যত গর্বই করুক না কেন, তাদের অধিকাংশ পূর্বপুরুষ ছিল নির্মম ও নৃশংস, এবং মানবিকতাশূন্য। এখনো দুনিয়া জুড়ে তারা শান্তির নামে হত্যাযজ্ঞ করে বেড়ায়।

এই ঘটনার পর মথুরানাথ নীল বিদ্রোহীদের সাথে এক হয়ে সরাসরি নীলচাষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁরা একজোট হয়ে ম্যাকনেয়ারের কুঠিতে হামলা চালান। ম্যাকনেয়ার পালিয়ে যায়।

– তারপর কী হলো?

– এর প্রায় বারো দিন পরে বিপ্লবী দল ম্যাকনেয়ারকে দেখতে

https://nagorikpathagar.org

পায়। মথুরানাথ দূর থেকে ম্যাকনেয়ারকে গুলি করেন। সেই গুলি তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয় এবং গুরুতর আহত ম্যাকনেয়ার নৌকায় উঠে পালাতে চেষ্টা করে। নীল বিদ্রোহীরা আগুনের তীর ছুড়ে নৌকাসহ ম্যাকনেয়ারকে পুড়িয়ে মারে।

– এরকম আরও কত বীর আছে? আমি বলি।

– হ্যাঁ, এরকম অসংখ্য ঘটনা নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাঙলায় ঘটেছিল। এবং এসব ঘটনায় সাধারণ মানুষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন পিটার গ্রান্ট লেখেন, "শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ যা আমরা বাঙলাদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল একটা রঙ-সংক্রান্ত অতিসাধারণ বাণিজ্য-প্রশ্ন না ভেবে গভীরতম সমস্যা বলেই ভাবা উচিত। যারা এটি করতে ব্যর্থ, তারা সময়ের ইঙ্গিত ধরতে পারছেন না বলে আমার ধারণা।"

ব্রিটিশ জমিদার ও বণিক সমিতির সভাপতি ম্যাকিন্টশ ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে ভারত সচিব চার্লস উডকে এক চিঠিতে লেখেন, "গ্রামাঞ্চলে অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। কৃষকেরা তাঁদের ঋণ ও চুক্তিপত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, মহাজন ও মালিক ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন করে হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এবং সকল ঋণ রদ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।"

বড়লাট লর্ড ক্যানিং নীল বিদ্রোহের দুই মাস পরে ইংল্যান্ডে চিঠি লেখেন, "নীল চাষীদের বর্তমান বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহকাল আমার এতই উৎকণ্ঠা হয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনার (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ) সময়ও আমি এতটা চিন্তিত হইনি। আমি সবসময় চিন্তা করেছি যে যদি কোনো নির্বোধ নীলকর ভয়ে বা ক্রোধে একটি গুলিও ছোড়ে, তাহলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"

https://nagorikpathagar.org

নিজেরা রক্ষা পেতে নীলকরেরা ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে স্মারকপত্র দেয়। সেখানে তারা জানায়, "কৃষককুল সংগঠিতভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাঁদের দিয়ে আর নীলের আবাদ করানো সম্ভবপর হচ্ছে না। আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাচ্ছে না, কারণ আমাদের অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যাবে না। এমনকি আমাদের কর্মচারীরাও আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে সাহস পাচ্ছে না ... রায়তরা বর্তমানে খুবই মারমুখী। তাঁরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষেপে গেছে। তাঁরা বর্বরের মতো যেকোনো দুষ্কার্য করতে এখন প্রস্তুত। প্রতিদিন তাঁরা আমাদের কুঠি এবং বীজের গোলায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের প্রায় সকল কর্মচারী ও চাকরেরা কুঠি ত্যাগ করে চলে গেছে। কারণ প্রজারা তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া বা খুন করার ভয় দেখাচ্ছে। যে দুই-একজন আছে, তারাও খুব শীঘ্র চলে যেতে বাধ্য হবে। কারণ পার্শ্ববর্তী বাজারেও তারা খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতে পারছে না। সকল জেলাতেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।"

বাঙলার ছোটলাট গ্রান্ট স্বচক্ষে অবস্থা দেখতে স্টীমারে করে গোপনে ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে ৭০ মাইল দীর্ঘ জলপথ পরিভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যাত্রা শুরুর পর কোনোভাবে প্রজারা জেনে ফেলে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ স্টীমার তীরে ভেড়াবার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে ঝাঁকিজাল ও কোঁচ। গ্রান্ট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নদীর মাঝ দিয়ে স্টীমার চালাবার আদেশ দেন। কিন্তু পথ কোথায়? নদী মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ। গ্রান্ট ভয় পেয়ে যান। কিন্তু জনতা তাঁকে অভয় দেয়, তিনি অতিথি, তাঁর জীবনের কোনো ভয় নাই। স্টীমার তীরে ভেড়ানো হলো। গ্রান্ট সবাইকে পাবনা যেতে বললেন। বললেন, সেখানে জনসভায় তিনি নীল চাষ তুলে দেওয়ার ঘোষণা দেবেন। এবার স্টীমার চলল পাবনা। জন

https://nagorikpathagar.org

পিটার গ্রান্ট নিজেই এ অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। বলেছেন, প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে ৬০-৭০ মাইল পথ ভ্রমণকালে তিনি নদীর উভয় পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড় দেখেছেন। এমন দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য আর কোনো রাজকর্মচারীর হয়নি।

পাবনায় গিয়ে জনসভায় গ্রান্ট বলেন, "অতি শীঘ্রই নীল চাষ বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চাষীর ইচ্ছা ব্যতীত কাউকে জোর করে নীল চাষ করানো যাবে না। কেউ জোর করে নীল চাষ করালে আইন কঠোর হাতে তাকে দমন করবে।"

যারা জুলুমবাজ নীলকর ছিল, বিপ্লবের মুখে তারা ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়, অথবা কৃষকদের সাথে যুদ্ধে প্রাণ হারায়। শুধুমাত্র যারা প্রজাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে শিখেছিল, তাদের কুঠিই টিকে থাকে।

এর মধ্যেই জার্মানীতে কৃত্রিম রঙ আবিষ্কৃত হয়। এতে নীলকরদের লাভ পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। ফলে সব মিলিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে নীল চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বাঙলার কৃষক মুক্তি পায় ঘৃণ্য নীলকরদের হাত থেকে।

– আগের কোনো বিদ্রোহই তো সফল হয়নি, নীল বিদ্রোহ সফল হলো কীভাবে?

– নীল বিদ্রোহের সাফল্যের পিছনে কারণ তিনটি। প্রথমত, নীল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উৎপত্তি কৃষকশ্রেণী অর্থাৎ উৎপাদক শ্রেণীর হাতে। এই বিদ্রোহে গ্রাম-সমবায় আরও মহৎ হয়ে শ্রেণী-সমবায়ে পরিণত হয়। একজন নেতা হারালে আক্ষরিক অর্থেই একশোজন এসে সে শুন্যস্থান পূরণে সক্ষম ছিল। সুতরাং নেতৃত্ব পরিচালনায় কখনো ছেদ পড়েনি। দ্বিতীয়ত, তখন নব্বই শতাংশ লোক কৃষিকাজ করতো। এরা যেকোনো বিদ্রোহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তিনিই যখন বিদ্রোহ

https://nagorikpathagar.org

করেন, সে-বিদ্রোহ থামানোর সাধ্য কার? তৃতীয়ত, কৃষকদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। রুখে দাঁড়াতে হবে, নইলে না খেয়ে মরব– এতটাই সরল ছিল তাঁদের ভাবনা।

আর এই কারণেই বাঙলার সর্বপ্রথম সফল বিদ্রোহ হচ্ছে নীল বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহ নিয়ে অনেক ঘটনা আর গল্প আছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' নামে এক মর্মস্পর্শী নাটক লিখেছিলেন। তবে গণমানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা এই মানবিক অথচ মহাকাব্যিক চরিত্রগুলো নিয়ে রচিত হতে পারতো অসংখ্য গান, কবিতা, নাটক; তৈরী হতে পারতো সিনেমা, শিশুদের কমিক্স। সেটা হয়নি। নিম্নবর্গের বীরত্বের ইতিহাস রচনায় শহুরে মধ্যবিত্তের কলমের কালি শুকিয়ে যায়।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবী দল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী

নীল বিদ্রোহের দীর্ঘ কাহিনী শুনে আমার ভাবনায় একটি বিষয় ঘুরছে। এটা বাবাকে বলি।

– কোন বিষয়টা?

– আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সব মানুষের এক হলে নেতার অভাব হয় না এবং সেই আন্দোলন সফল হয়।

– সাবাস! টাট্টু পুটুম এইবার সত্যি প্রফেসর টাবুল হয়ে গেছে!

– আচ্ছা, এবার কোন পর্ব?

– এবার সশস্ত্র পর্ব। এর মধ্যেই মূলত বাঙলায় ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ছোট-বড় অনেক গোপন বিপ্লবী সংগঠন। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী গ্রুপগুলোকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে ওঠে। একের পর এক তারা বিপ্লবীদের ধরে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজু করে শারীরিক নির্যাতন করা থেকে শুরু করে আন্দামান, আলীপুরসহ

https://nagorikpathagar.org

ক্ষুদিরামের
ফাঁসী

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো শুরু করে। এমন একজন নিষ্ঠুর ব্রিটিশ বিচারক ছিলেন কিংসফোর্ট, যিনি বিপ্লবীদের কঠিন সাজা দিতেন। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে। সুশীল সেন নামের ১৩ বছরের একটা ছেলে এক পুলিশ সার্জেন্টকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়। সুশীল সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হলো। কিংসফোর্ট বিচারক; বিচারে ১৫টি বেত্রাঘাত মারার হুকুম দিলো। বেত মারা শুরু হলো। সুশীল সেন রক্তাক্ত হয়ে দুঃসহ যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। খবরটি দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়লো। সকল তরুণ বিপ্লবী এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজকে শাস্তি দিতে চাইলো।

– ১৩ বছরের শিশুকে বেত্রাঘাত? আমি অবাক হয়ে বলি।

– হ্যাঁ, এটাই আত্মম্ভরী ব্রিটিশদের ইতিহাস।

গোপীমোহন দত্তের ১৫ নম্বর বাড়ী ছিল বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্র। এখানে বসেই হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর শক্তিশালী বইবোমা তৈরী করলেন। এ বোমা বইয়ের ভাঁজে রাখা যেতো। বেশ কৌশলে একটি বই কিংসফোর্টের কাছে পাঠানো হলো। কিন্তু কিংসফোর্ট বই না খোলার কারণে সে-যাত্রায় বেঁচে গেলেন।

আবার নতুন প্রস্তুতি। এবার বোমা মেরে মারা হবে কিংসফোর্টকে। এবার দুইজনকে বেছে নেওয়া হলো। বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী আর মেদিনিপুরের ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের কাছে বোমা পৌঁছে দেওয়া হলো, আর দেওয়া হলো রিভলবার কেনার জন্য কিছু টাকা। এই প্রথম দুজন একত্রিত হলেন রেলস্টেশনে। এর আগে কেউ কাউকে চিনতেন না। কথা হলো। তাঁরা সতর্কতার সাথে চলে গেলেন মজফ্ফরপুরে। মজফ্ফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর ছদ্মনাম ছিল দীনেশচন্দ্র রায়। মজফ্ফরপুরে ইউরোপিয়ান ক্লাবে কিংসফোর্ট প্রতিদিন মদ পান ও আড্ডা দিতে যেতো, আর ফিরতো রাত ৮টায়।

https://nagorikpathagar.org

এই সুযোগটাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন বলে স্থির করলেন। প্রতিদিন ক্লাব হাউস থেকে সাদা ফিটন গাড়ীতে ফিরে আসেন কিংসফোর্ট। কিংসফোর্টকে হত্যা করার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় তাঁদের পাঁচ-পাঁচটা দিন চলে গেল। টানা ছয় দিন অপেক্ষা করার পর তাঁরা কিংসফোর্টকে হত্যার সুযোগ পান।

সেদিন ছিল ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮। অন্ধকার পিচঢালা পথ দিয়ে সাদা ফিটন গাড়ীটি আসছিল। গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু ওই গাড়ীতে কিংসফোর্ট ছিলেন না। ছিলেন দুজন ইংরেজ রমণী; দুঃখজনকভাবে তাঁরা মারা যায়। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী দুজন দুদিকে পালিয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম অনেক সতর্কতার সাথে মজফ্ফরপুর থেকে ২৪ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়ালি স্টেশনে পৌছায়। প্রচণ্ড পানির তৃষ্ণায় তিনি একটি খাবার দোকানে পানি খেতে যান। পুলিশ সমস্ত শহরে আততায়ীকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। সাদা পোশাকের পুলিশ ক্ষুদিরামকে সন্দেহ করে। ঠিক পানি খাওয়ার সময় দুজন পুলিশ ক্ষুদিরামের দুই হাত শক্ত করে ধরে। সাথে সাথে আরো ৫/৬ জন পুলিশ ক্ষুদিরামকে ঘিরে ফেলে। ক্ষুদিরামও দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে পারেননি। ক্ষুদিরাম বোমা হামলার সব দায় নিজের কাঁধে নেন। সহযোগীদের কথা বলেন না। ফলে বোমা হামলা ও দুজনকে হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর আদেশ হয়।

অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকী আলাদা পথে পালান। প্রফুল্ল ছদ্মবেশে ট্রেনে করে কোলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। ট্রেনে নন্দলাল ব্যানার্জী নামে এক দারোগা বিহারের সমস্তিপুর রেলস্টেশনের কাছে প্রফুল্লকে দেখে সন্দেহ করে। ওই দারোগা সন্দেহ করেছে

https://nagorikpathagar.org

এটা বুঝতে পেরে প্রফুল্ল পালাবার চেষ্টা করেন। ট্রেন থেকে নেমে তিনি দৌড়ে অনেকটা দূর গিয়েছিলেন। কিন্তু নন্দলাল তাঁর পিছু ছাড়েনি, বরং ডাকাত ডাকাত বলে চীৎকার করতে থাকে। তখন স্টেশনের পাহারারত পুলিশ প্রফুল্ল চাকীকে ধরার জন্য ধাওয়া করে। প্রফুল্ল চাকী দারোগা নন্দলালকে তাক করে গুলিও ছুড়েছিল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

পুলিশ তাঁকে জীবন্ত ধরার জন্য প্রায় তাঁর কাছাকাছি চলে গেছে। এমন সময় পকেটে রাখা রিভলবার বের করে চিবুকের নীচে গুলিবর্ষণ করে প্রফুল্ল চাকী আত্মাহুতি দেয়। সেদিন ছিল ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মে, বেলা ১২টা। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করার প্রায় তিন মাস দশ দিন পর ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ক্ষুদিরামকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

আমি চুপ করে থাকি।

– সারা ভারত ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে যায়।

– তারপর কী হয়?

– মানুষ তাঁর প্রতিবাদের কথা, কষ্টের কথা, বিজয়ের কথা গানে লিখে যায়। আমরাও একটা অমর গানে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর জীবন উৎসর্গের কথা লিখেছি। গানটা লিখেছিলেন বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস। আজ ১০০ বছর পরেও সেই গান আমরা একই আবেগ নিয়ে গাই। তোমার মনে আছে সেই গানটা?

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসী দেখবে ভারতবাসী ॥
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলেম রাস্তার ধারে, মাগো,

https://nagorikpathagar.org

বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী ॥
হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা, মাগো,
রক্ত-মাংসে এক করিতাম
দেখতো জগৎবাসী ॥
শনিবার বেলা দশটার পরে
জজকোর্টেতে লোক না ধরে, মাগো,
হলো অভিরামের দীপ জ্বালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসী ॥
বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইলো মা তোর বেটা-বেটি, মাগো,
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বউদের করিস দাসী ॥
দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নেবো মাসীর ঘরে, মাগো,
তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসী ॥

– প্রফুল্ল চাকীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি ব্রিটিশদের নির্মমতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

https://nagorikpathagar.org

বিপ্লবী আন্দোলন ও মাষ্টারদা সূর্য সেন

আমি আবার চুপ হয়ে যাই এভাবে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর গল্প শুনে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁরা বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বলেন, বীরের মতো মৃত্যু সবাই বরণ করতে পারে না। আমরা এবার আরেকজন বীরের গল্প শুনবো। তাঁর নাম সূর্য সেন। তিনিও বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকে সবাই মাষ্টারদা নামে চেনে।

দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করতে কিছু বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এমন দুটি সংগঠন ছিল যুগান্তর ও অনুশীলন। বাঙলাদেশে বিপ্লবীরা তখন এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। সূর্য সেন ছিলেন একজন বিপ্লবী এবং 'যুগান্তর' দলের চট্টগ্রাম শাখার প্রধান। সূর্য সেনের জন্ম ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। পুরো নাম সূর্যকুমার সেন। ডাকনাম কালু। তিনি ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে

https://nagorikpathagar.org

'ন্যাশনাল স্কুল'-এ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষকতা করার কারণে তিনি পরিচিত মহলে 'মাষ্টারদা' আখ্যা পান।

বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং দেওয়ানবাজার এলাকায় 'সাম্যাশ্রম' নামের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকেই গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়াম অনুশীলনের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি নদীতে সাঁতার কাটা, নৌকা বা সাম্পান চালানো, গাছে আরোহণ করা, লাঠিখেলা, ছোরা নিক্ষেপ, মুষ্টিযুদ্ধের মতো শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরীর প্রশিক্ষণ দেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার ফসল। ঐদিন বিপ্লবীদের কর্মসূচি ছিল পুলিশের ও অক্সিলারি ফোর্সের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ ও চট্টগ্রামের সাথে রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

১৮ তারিখে গুড ফ্রাইডে থাকায় সেদিন ইউরোপীয় ক্লাবে ইংরেজ পদস্থ কর্মকর্তারা কেউ উপস্থিত ছিল না এবং অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগারে ভারী অস্ত্র মিললেও কোনো গুলি পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশের অস্ত্রাগার দখলের পর অল্প অস্ত্র ও গুলি সংগৃহীত হয়। অস্ত্রাগারে আগুন লাগানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন বিপ্লবী হিমাংশু বিমল সেন। সূর্য সেন দলবল নিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। তিনি দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বিপ্লবী দল চট্টগ্রামে গিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে।

ইংরেজরা সূর্য সেনের দলকে ধরতে তাঁদের গোপন আস্তানায়

https://nagorikpathagar.org

হানা দেয়। কিন্তু সূর্য সেনের দল বুঝতে পারলে যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে ১৪ জন বিপ্লবী শহীদ হন। সূর্য সেন সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে আরও দুর্গম পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের ধরার জন্য ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে। সূর্য সেনকে গ্রেফতার করতে না পারলেও সরকার ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সূর্য সেনের অনুপস্থিতিতেই চট্টগ্রামের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুরু করে। ১৯৩২ সালের জুন মাসে মাষ্টারদা সূর্য সেন প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে বোমা সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম কারাগার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সে-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই ঘটনায় ১১ জন বিপ্লবী গ্রেফতার হন। এর পরে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাবে সফল আক্রমণ চালান, তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হন এবং সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

এ ঘটনার পরে মাষ্টারদা পটিয়ার কাছে গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের একজন সূর্য সেনের লুকিয়ে থাকার তথ্য পুলিশকে জানিয়ে দেয়।

– বাঙালীরাই সূর্য সেনকে ধরিয়ে দেয়?

– বাঙালীরাই বলা ঠিক নয়। তবে কোনো কোনো বাঙালী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রায় তিন বছর পর পর্যন্ত সূর্য সেন চট্টগ্রামেই ছিলেন এবং একাধিক অপারেশন চালিয়েছেন, কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে ধরতে পারেনি।

– কবে উনি ধরা পড়লেন?

– ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে একদল গুর্খা সৈন্য গোপন স্থানটি ঘিরে ফেলে। সৈন্যবেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সূর্য সেন ধরা পড়েন। সঙ্গে ছিলেন কল্পনা দত্ত,

https://nagorikpathagar.org

শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দাসগুপ্ত ও মনিলাল দত্তসহ আরও কয়েকজন বিপ্লবী। সূর্য সেনকে গ্রেপ্তারের পরে নির্মম নির্যাতন করা হয়।

'যুগান্তর' দলের চট্টগ্রাম শাখার নতুন সভাপতি তারকেশ্বর দস্তিদার সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম জেল থেকে ছিনিয়ে আনার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। তারকেশ্বরের সঙ্গে আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তের বিশেষ আদালতে বিচার হয়। ১৪ই আগস্ট সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর রায় হয় এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম কারাগারে উভয়ের ফাঁসী কার্যকর হয়।

– সবাইকেই তো ইংরেজরা মেরে ফেলেছে, না হলে ফাঁসী দিয়েছে দেখছি।

– হ্যাঁ, পরাধীন জাতির উপর দখলদার জাতি এভাবেই অত্যাচার করে। অত্যাচার দীর্ঘ করতে ধর্মীয় বিভাজন উস্কে দেয়, জাতিকে বিভক্ত করে। এভাবেই ইংরেজরা আমাদের ধর্মীয় বিভাজন উস্কে দিয়ে বাঙলাকে ভাগ করে দিয়ে গেছে ১৯৪৭ সালে।

– তার মানে কি বাঙলার মানুষ এই ভাগাভাগি চায়নি?

– আসলে বাঙলার মানুষের মধ্যে ধর্মের বিভাজন আর হানাহানি যাতে বেড়ে যায় তার জন্য ইংরেজরা চেষ্টা করেছিল প্রায় অর্ধশত বছরেরও বেশী সময় ধরে। আর বাঙলার পূর্ব অংশে মুসলমান আর পশ্চিম অংশে হিন্দু ধর্মের অনুসারী মানুষ বেশী ছিল। হানাহানি বেড়ে গেলে বাঙালী দূরবর্তী তাৎপর্য না বুঝেই সরল সমাধান হিসেবে বাঙলা ভাগকেই মেনে নিয়েছিল। তবে আমাদের বুঝতে হবে ইংরেজরা আমাদের বিভাজন

https://nagorikpathagar.org

চেয়েছিল, বিভাজনের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এবং সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দুইভাগ করে দিয়ে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার বাউল

এ পর্যন্ত শুনে তো আমার মনে হচ্ছে বাঙলায় শুধু বিদ্রোহই হয়েছে। আমি খুব হতাশ হয়ে বলি।

– হ্যাঁ, কথাটা মোটামুটি ঠিক। বিদ্রোহ বাঙলার অস্তিত্বে। এখানকার শাসকরাও দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেনি। আর্য ধর্মকে এরা প্রতিহত করেছে। বাঙলাই প্রতিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে, বাঙলাই হিন্দু ধর্মের মানবিক সংস্কার করেছে। এমনকি প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনেক গৌণ ধর্ম সৃষ্টি করেছে। এগুলোর কথা বড় হলে জানতে পারবে, যেমন সাহেবধনি, বলরামি, কর্তাভজা, লালন শাহী।

– এগুলো কি ধর্ম ছিল?

– না, ঠিক ধর্ম বলা যায় না, তবে আধ্যাত্মিকতা ছিল এই চর্চাগুলোতে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিকাশ লাভ করেছে বাউল দর্শন। এটার কেন্দ্রে রয়েছে ফকির লালন শাহ, তাঁর গান ও সাধনার ধারা।

– বাউল দর্শন কী?

https://nagorikpathagar.org

– এটাকে আসলে বাউল বলাও ঠিক নয়। উনারা নিজেদের বাউল পরিচয় দিতেন না।

– তাহলে কী বলতেন?

– ফকির বলতেন।

– তাহলে আমরা যে বাউলগান শুনি?

– সেটার নাম হওয়া উচিত "ভাবসঙ্গীত"। আর বাউল দর্শনকে বলা উচিত "বাঙলার ভাব"। বাউলেরা মনে করেন মানুষেই ঈশ্বরের বাস। তাই সেই অধরাকে মানুষ ভজেই তারা ধরার চেষ্টা করে। তাদের জীবনে আছে বিশেষ আচার।

– এদের কোনো ধর্মগ্রন্থ আছে কি?

– না নেই, এরা এদের আধ্যাত্মিকতার কথা গানে গানে প্রচার করে। এদের গানে আছে বাঙলার মৌলিক চিন্তা। এই বাউলেরা ছিলেন দরিদ্র নীচুতলার মানুষ। তাই এদের দর্শন শহুরে মানুষের নজরে আসেনি। শহুরে মানুষেরা বাউল-দর্শন বুঝতে চেষ্টাও করেনি। এখন এসব নিয়ে কাজ করছে অনেকেই। আমরা এই বাউল-দর্শনের হাত ধরে পৃথিবীর সাথে নতুন দেওয়া-নেওয়া করতে পারবো চিন্তার জগতে।

https://nagorikpathagar.org

শেষ কথা

বাঙলার মূল ইতিহাস এই মাটির মানুষদের ইতিহাস।

ইতিহাসের নির্মাতা মানুষ; রাজা বা বাদশাহরা নয়। রাজা বা বাদশাহরা এই মাটির মানুষদের প্রাণশক্তিকে যখনই উন্মুক্ত করে দিতে পারেন তখন জাতি এগিয়ে যায়। বাঙলার ইতিহাসে এমন সময় এসেছে। আজকে বাঙলা কোনো সমৃদ্ধ জনপদ নয়। বাঙলা পৃথিবীর কাছে তার যোগ্য মর্যাদা পায় না। এক বিপুল জনশক্তি নিয়ে এই জাতি ঘুমিয়ে আছে। বিস্মৃতির বিষ শরীরে নিয়ে লক্ষিন্দরের মতো অচেতন হয়ে বেহুলার ভাসানো ভেলায় লক্ষ্যহীন যাত্রায় আমরা ভেসে চলেছি। তোমাদের কাছে এই জাতির ইতিহাস বলে গেলাম। একদিন তোমরাই এই ইতিহাস থেকে শক্তি নিয়ে এই জাতির ঘুম ভাঙিয়ে নক্ষত্রের পথে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের যে যেতেই হবে। কারণ এ শুধু বাঙলা নয়, এ মহাস্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই মহাস্থানের ইতিহাস-নির্ধারিত ভূমিকা আছে, এই জাতির কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালন করতেই হবে, হয় তোমাদের নইলে তোমাদের পরের প্রজন্মকে, নইলে এই জাতির মুক্তি নেই।

https://nagorikpathagar.org

প্রথম সংস্করণের পরিকথন

১ম সংস্করণে লেখা হয়েছিল বখতিয়ার নালন্দা ধ্বংস করে তার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়। এই তথ্যটির বিষয়ে লেখক নিঃসংশয় নয়। বখতিয়ার নালন্দা ধ্বংস করেছে এমন ইতিহাসনির্ভর তথ্য নেই। বরং বখতিয়ারের মৃত্যুর পরেও ধরমসাভমিন নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু নালন্দায় পড়তে এসেছেন সেটা তাঁর জীবনকাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে সংশোধন করা হলো।

ইস্তেখাব আলম চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল শাফি মজুমদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁরা প্রথম সংস্করণটি পাঠ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলার ইতিহাসের আনুমানিক কালপঞ্জী

গুপ্ত সাম্রাজ্য : ৩২০–৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ
শশাঙ্ক : ৫৯৩–৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ
মাৎস্যন্যায় : ৬৩৭–৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ
পাল : ৭৫৬–১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ
সেন সাম্রাজ্য : ১০৭০–১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ
বখতিয়ার ও অন্যান্য : ১২৩০–১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দ
ইলিয়াস শাহী রাজবংশ : ১৩৫২–১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ
বায়েজিদ শাহী রাজবংশ : ১৪১৩–১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ
রাজা গণেশের পরিবার : ১৪১৪–১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী রাজবংশ : ১৪৩৫–১৪৮৭ খিষ্টাব্দ
হাবসি শাসন : ১৪৮৭-১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
হোসেন শাহী রাজবংশ : ১৪৯৪–১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ
সুরি সাম্রাজ্যের অধীন বাংলার গভর্নর : ১৫৩৮–১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ
মুহাম্মদ শাহ রাজবংশ : ১৫৫৪–১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ
কররানী রাজবংশ : ১৫৬৪–১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ
মুঘল শাসন : ১৫৭৭–১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ
নবাবী শাসন : ১৭১৭–১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ
ব্রিটিশ শাসন : ১৭৫৭–১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

https://nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১. রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫।
২. নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।
৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং।
৪. প্রমোদ সেনগুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালি সমাজ*। র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব ১৯৭৮।
৫. *বাঙলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৬. রবিরঞ্জন ভট্টাচার্য, *ইতিহাসে ভূভারত*, করতোয়া প্রকাশনী, শিলিগুড়ি।
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলা দেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা, ১৩৫২।
৮. রিচার্ড এম ইটন, *বঙ্গীয় মুসলিম কাঁহারা, বাঙলার ধর্মান্তর এবং ইসলামিকরণ সম্পর্কে কিছু কথা*। ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
৯. সুকুমার সেন, *'বঙ্গ ভূমিকা'*, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাদেমি।
১০. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*।
১১. সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*। কলিকাতা প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট, ১৯৬৩।
১২. শ্রী রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, মনোমোহন প্রকাশনী, ১৯৬০, কলিকাতা।
১৩. বিহারিলাল সরকার; সম্পাদনাঃ বারিদবরণ ঘোষ, *বঙ্গে বর্গী*, কারিগর, প্রকাশকালঃ ২০১৬, কলিকাতা।

https://nagorikpathagar.org

অন্যান্য তথ্যসূত্র

১. এম. এ. বারি, চুয়াডাঙ্গা গ্যাজেটিয়ার।
২. কাজল রশীদ, 'মাটির নবাব', *প্রথম আলো*, ঢাকা।
৩. তাজুল ইসলাম, *চুয়াডাঙ্গার করুণ কথা*।
৪. বিমলেন্দু করনি, 'বিশে ডাকাত'।
৫. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন, *নীল বিদ্রোহের নানাকথা*।
৬. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন, *ভুলে যাওয়া নীল : রক্তে রাঙ্গানো বিপ্লব।*
৭. মোহিত রায়, 'কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, অক্টোবর ১৩, ১৯৬১।
৮. প্রফেসর শঙ্কু, 'নীল বিদ্রোহ : বাংলার সর্বপ্রথম সফল বিদ্রোহ' (ব্লগ)।
৯. শ ম শওকত আলি, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস*।
১০. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*।

https://nagorikpathagar.org

বাঙলা আর বাঙালীর ইতিহাস বিচিত্র
আর বহুবর্ণ। এই জাতির গড়ে ওঠার
নানা পর্যায়ে আছে উত্থান-পতন,
গৌরব-গর্ব আর লাঞ্ছনা-অপমানের নানা
ঘটনা। আজকের বাঙালীর দুর্দশার জন্য
তার উপর চলা অবিচার আর
অত্যাচারের একটা ভূমিকা আছে।
কিশোর-তরুণদের উপযোগী করে লেখা
এই বইটিতে বাঙলার সেই বহুবর্ণ
ইতিহাসের একটা অংশ তুলে ধরার চেষ্টা
করা হয়েছে পিতা আর পুত্রের
কথোপকথনের মাধ্যমে। এখানে বাঙলা
বলতে অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গকে বোঝানো
হয়েছে। এই গ্রন্থ আগামী প্রজন্মের কাছে
বাঙালীর ইতিহাসের এক নতুন দিক
উন্মোচন করবে নিঃসন্দেহে।

Baatighar
Publication

Cover Silentext
Price BDT 400.00 USD 20.00
facebook.com/BaatigharPub

Sonar Banglar Rupali Kotha
A History of Bengal
from Ancient Period to British Regime
by Pinaki Bhattacharya

9 789848 825167

https://nagorikpathagar.org